অববাহিকা

জন্মদিন সংখ্যা ১৪২০

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।।

শুভ জন্মদিন

সম্পাদকীয়

এখনও কিছু বাকি আছে। আবহাওয়া অফিস যাই বলুক না কেন, বাংলা ক্যালেন্ডারের পাতায় তার সগর্ব উপস্থিতি। আর এই শেষ হতে চলা জ্যৈষ্ঠেই আত্মপ্রকাশ করেছিল 'অবকাশ'। হাঁটি হাঁটি পা পা করে পেরিয়ে এল গোটা বছর।

বিশ্বব্যাপী এই হানাহানির যুগে, যখন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রোজ স্থান পাচ্ছে কোনও না কোন দুর্নীতির কথা, অবৈধ আগ্রাসনের কথা, যখন অবর্ণনীয় এক অস্থিরতাকে পরিহার্য কিন্তু অনিবার্য সঙ্গী বলে ভাবতে শিখে জন্ম নিচ্ছে এই গ্রহের অসংখ্য মানবশিশু, তখন 'অবকাশ' শুধু চেয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কতিপয় সচেতন মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে, সামনে আনতে চেয়েছে এক অন্য ভাবনা। একটাই উদ্দেশ্য, রোজ দেখতে অভ্যস্ত চোখের বাইরেও একটা জগত আছে, সেটা প্রমান করা।

ফেলে আসা বছরে বার বার 'অবকাশ' ধরা দিয়েছে এক অনাস্বাদিত নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে। হয়ত "যত বড় রাজধানী, তত বিখ্যাত নয় এ হৃদয়পুর" এবং সেই কারনেই বিদ্রোহী কবির জন্মমাসে পৃথিবীর আলো দেখেও 'অবকাশ' বিদ্রোহী তো অবশ্যই কিন্তু রণক্লান্ত নয়।

অদিতি কবির খেয়া

সূচিপত্র

- জয় গুরুদোংমার ১-১৪
- কোমল বিদ্রোহ ১৫
- রামুর বাঘ ১৬
- অসুখ পুষি অবসরে ১৭-১৮
- অসমাপ্তি ১৯
- বিনা কথায় ২০
- রেসিপি ২১
- অপূর্ণ বিদ্যা ২২-২৬
- প্রত্যাবর্তন ২৭-৪২
- এক টুকরো আকাশ ৪৩-৫৯
- ট্রামের ভিড়ে ৬০-৬২
- আমার গাড়ি চালানো, সৃজন আর ফেসবুক ৬৩-৬৫
- আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে ৬৬-৬৭
- আমি এবং সুকুমার ৬৮-৬৯
- দুই বিঘা জমির পরবর্তী সংস্করণ ‘একটি মুদিখানার দোকান’ ৭০-৭৮
- পিতৃরূপেণ ৭৯-৮৩
- বিবর্তন ও বৃদ্ধাশ্রম ৮৪-৮৯
- পদাবলী গাথার নামাবলী ও চণ্ডীদাস ৯০-১০৪
- একশো বছরের সন্দেশ ১০৫-১১৬
- সিনেমা মানে ঝিঁ ঝিঁ-ভারতীয় সিনেমার একশো বছর ১১৭-১২৪
- শব্দছক ১২৫-১২৬

জয় গুরুদোংমার

প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্যাংটকের উত্তর প্রান্তে ভাড়া-গাড়ির বহুতলবিশিষ্ট স্ট্যান্ড। তারই একটা তলা থেকে আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে মহিন্দ্রা ম্যাক্সটা যখন ছাড়ল তখন ঘড়িতে বেলা এগারোটা।

কলকাতায় আজকাল খুব ঠাণ্ডা পড়লে যত হয় এখানে এই এগারোই ডিসেম্বরে ততটাই ঠাণ্ডা পড়েছে। আমরা চলেছি উত্তর সিকিম। দু'রাত তিনদিনের চুক্তি। আজ গিয়ে রাতে থাকার কথা একশ বাইশ কিলোমিটার দূরের লাচেনে। কাল সকালে বেরিয়ে দেখতে যাব গুরুদোংমার লেক। দেখে চলে যাব লাচুং। সেখানে কালকের রাতটা কাটিয়ে পরশু ইয়ুমথাং উপত্যকা দেখে আবার গ্যাংটকে ফেরার কথা। এসবের জন্য থাকা-খাওয়া মিলে জনপ্রতি খরচ তিন হাজার টাকা। এদিক ওদিক থেকে রেট যাচাই করে দেখে নিয়েছি, এরা একদম ঠিক নিচ্ছে। শুধু বেরোবার আগে আমাদের গাড়ির রিসোলড টায়ার আর মসৃণ স্টেপনি দেখে মনটা হুহু করে উঠতে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল যে সব গাড়িরই একই হাল।

গাড়ির ড্রাইভার নেপালি। নাম জীবন মুখিয়া। তাকে জি-ওয়ান বলে ডাকতে সে মহা খুশি। বলল, "ওই শাবজী, ম্যায় আপকো বড়িয়া খানা খিলাউঙ্গা, আপ্না আপ্না জাগা দিখাউঙ্গা, আপ ডুন ওরি।" তার বয়স পঁচিশ হলেও দেখে মনে হয় উনিশ। ছোট্টখাট্ট ফর্সা এই বাচাল যুবকটি সব সময়তেই হাসছে ও সুর করে কথা বলছে।

চলার পথে কখনও তিস্তা, কখনও তার উপনদীরা ফিরে ফিরে এল অসংখ্যবার। কখনও পাশ দিয়ে গেলাম, কখনও ডিঙিয়ে গেলাম। সংকীর্ণ পাহাড়ি পথে যেতে যেতে প্রকৃতির রূপে চোখ জুড়োলাম। পথে পড়ল সাতটা ধাপে নেমে আসা সেভেন সিস্টার ফলস। মংগনের আগে একটা ছোট্ট গ্রামে জি-ওয়ানের বাড়ি। সে তার মাসির হোটেলে আমাদের গরম গরম আলুভাজা, ডাল ও রুই মাছের ঝোল দিয়ে ধোঁয়া ওঠা ভাত খাওয়াল। তার সুন্দরী যুবতী মাসি তাঁর ফুলের মত শিশুটিকে পিঠে রেখে নিজের সঙ্গে কম্বলে প্যাক করে হিসেব নিকেশ করছিলেন।

ভরা পেট নিয়ে আবার রওনা দিলাম। মংগন ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়েছি, জি-ওয়ান মোবাইলে তার ট্র্যাভেল এজেন্টকে ধরল। নেপালি ভাষায় যা বলল তা হচ্ছে এই, গাড়ির ব্রেক চাপলেই ক্যাঁক-কুঁক আওয়াজ করছে, কী করব? আদেশ পেয়েই সে একটা ছোট গ্যারেজের সামনে গাড়ি থামিয়ে দিল। চাকার ব্রেকশু পাল্টাতে হবে।

কী আর করা। আমরা পায়ে পায়ে নেমে পড়লাম পাশের কমলা বাগানে। গাছের কমলাগুলো আকারে ছোট হলে হবে কী, রসে টইটম্বুর আর মিষ্টি টু দ্য পাওয়ার ইনফিনিটি। বাগানের মালিক সামান্য কিছু পয়সা নিল। কমলার আনন্দের সঙ্গে একটা চিন্তাও ঘুরতে লাগল, অনেকটা পথ বাকি, পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে না তো! কারণ, কাল ভোর চারটেতেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

ব্রেকশু কিনে এনে সেটা ফিট করতে সময় লাগল ঘণ্টা দেড়েক। আবার যখন গাড়ি ছাড়ল টের পেলাম আমাদের হাঁফও ছাড়ল। তিনটে বাজে। ঠিকঠাক চললে এখনও ঘণ্টা পাঁচেকের পথ।

চুংথাং কথার অর্থ হল দুই নদীর বিবাহ। লাচেন চু ও লাচুং চু (চু মানে নদী) মিলিত হয়েছে চুংথাং-এ। সেই চুংথাং পৌঁছতেই সূয্যিমামার ছুটি হল। আলো বেশ কম। এই চুংথাং থেকে ইংরেজি ওয়াই-এর মত দুটো রাস্তা চলে গেছে। বাঁদিকে গেছে লাচেন, ডানদিকে লাচুং। আমরা অবশ্যই লাচেনের রাস্তা ধরব। আপাতত একটা দোকানে দাঁড়িয়ে চায়ের ব্যবস্থা করা গেল। এটা আসলে একটা মিলিটারি ক্যান্টিন। এখানে কোন জিনিসটা যে নেই সেটা ভাবতেই মাথা চুলকোবার দরকার। জি-ওয়ানের দিকে তাকিয়ে দেখি মাথাটা সে-ই চুলকোচ্ছে, তবে কারণ অন্য। গাড়ির ডানদিকের পেছনের টায়ারে একটা লাথি মেরে সে বুঝেছে তা থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার চুল থেকে হাত সরিয়ে সে চটপট স্টেপনির সঙ্গে চাকাটা অদলবদল করতে লেগে পড়ল। স্টেপনিটা ঠিক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলল, “ডুন ওরি শাব।”

বড়লোকই হও বা ব্যাটালোক, হিন্দু-জৈন-শিখ-মুসলমান-পারসিক-খ্রিষ্টানি যাই হও না কেন, বাইরে ঘুরতে এলে ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম – ড্রাইভার। আমাদের কাছে সেই মুহূর্তে জলের আর এক নাম

জি-ওয়ান। তাই, হোক পকেট খালি বাট নৈব নৈব গালি। জি-ওয়ানের দ্রুত হাতে চাকা পাল্টানো মুখ বুজে দেখলাম, টর্চ জ্বেলে সাহায্য করলাম ও তারপরে গাড়ি চড়ে লাচেনের পথ ধরলাম।

আরও চব্বিশ কিলোমিটার পথ বাকি। পাহাড়ি রাস্তায় চব্বিশ কিলোমিটার অনেক হয়। যত এগোচ্ছি ঠাণ্ডা তত গভীরে দাঁত ফোটাচ্ছে। সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে এই লাচেনই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যাবার পথে ধূসর অন্ধকারে তেমন ভাল বুঝতে না পারলেও পরে ফেরার পথে ধ্বংসলীলা দেখে বুকটা কেঁপে উঠেছিল। একটা বেশ বড় স্কুলবাড়ি এখন শুধুই ধ্বংসস্তূপ। জানলাগুলো কোনরকমে ঝুলে আছে। মাটি থেকে ছাদ অবধি এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া ফাটলের মাঝে এপার-ওপার দেখা যাচ্ছে। শতাধিক শিশুর কলরব এক লহমায় মুছে গিয়ে শ্মশানের নৈঃশব্দ যেন গুমরে কাঁদছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময়ে দেখেছিলাম খাদের ওপারে জায়গায় জায়গায় পাথরের চাঁইয়ের ভীড় ঝর্নার মত ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। এছাড়া, কত পাহাড়ি ক্ষেত যে চাপা পড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত জায়গায় দেখেছি ছোটখাট ঘর কেউ যেন ছুড়ে একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফেলে দিয়েছে। এক সময় ভেজা রাস্তা মাড়িয়ে গাড়িটা চলতে রাস্তার ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে নেমে আসা একটা জলপ্রপাত। বাঁয়ে একটু দূরে একটা ভাঙাচোরা প্রকৃতি দেখার ঘর। জি-ওয়ান বলেছিল ভূমিকম্পের আগে ওই জায়গাটা একটা ট্যুরিস্ট স্পট ছিল। ভীমনালা ফলস। গাড়ি থেকে জলপ্রপাতের ছবি তুলব বলে ওকে একটু দাঁড়াতে বলেছিলাম। দেখেছিলাম ও ভয়ে বেশ জড়সড়। যেন চোখের সামনে দেখতে পেল ওপর থেকে একটা খুব বড় পাথরের চাঁই লাফিয়ে পড়ে আমাদের গাড়িটাকে চেপ্টে দিল।

যাইহোক, এখন অন্ধকারে গাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। খাদের ওপারে বেশ কিছু তারা এদিক-ওদিক ঠায় জ্বলে আছে দেখে বুঝলাম ওটা দূর থেকে দেখতে পাওয়া চুংথাং শহর। হঠাৎই আমাদের গাড়িটা থেমে গেল। জি-ওয়ান একটা বিরক্তি প্রকাশ করল। সামনে তাকিয়ে দেখি রাস্তা বন্ধ। জলপাই রঙের দুটো মিলিটারি ট্রাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেঁটে গিয়ে সমস্যাটা বুঝলাম। বাঁদিকের ট্রাকটার চাকা পাংচার। তার ডান পাশে যতটুকু জায়গা তা আরেকটা একই মাপের ট্রাক যাবার জন্য একদম সঠিক, একটুও বেশি-কম না। বাঁদিকের ট্রাককে আরও একটু

বাঁদিকে সরে যেতে বললে সে রাজি হয়নি কারণ তাতে তার টায়ার কেটে যাবে। ডানদিকের ট্রাকও নাছোড়বান্দা। সেও ডানদিক দিয়ে সামান্য এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কারণ আর এগোলে গাড়ি খাদে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। এখন বিশাল বড় চাকাটা পাল্টানো আর দুদলের মধ্যে মৃদু ঝগড়া চলছে।

নচিকেতা বলেছেন, মানুষ দু'প্রকার – জীবিত আর বিবাহিত। আমার কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল যে উনি একটা কম বলছেন, তৃতীয় প্রকার – মিলিটারি। এদের দৌরাত্ম্য দেশের সর্বত্র। লাইনে না দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আগে সবচেয়ে ভাল জিনিসটা চাই, কথায় কথায় কোটা দেখানো চাই, সব আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো চাই, সাধারণের কষ্টের তোয়াক্কা না করাটাকেই নিজেদের স্বভাব বানানো চাই।

কখনও দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করে, কখনও জোরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুদিকে মাথা নেড়ে আর কখনও নিজেদের মধ্যে গজর-গজর করে মিলিটারিগুষ্টির ষষ্টিপুজো করে একটা ঘণ্টা কাটালাম। তারপর ঝঞ্ঝাট কেটে গিয়ে আবার আমাদের গাড়ি ছাড়ল।

লাচেনের দু কিলোমিটার আগে ছাতেন বলে একটা গ্রাম। সেখানেই জি-ওয়ান দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঁদিকে একটা দোতলা বাড়ি। বলল সেই বাড়িতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজে। অতএব আমরা আর দেরি না করে গাড়ির দরজা খুলেই থেমে গেলাম। কী ভয়ানক শীত বাইরে! তাপমাত্রা খুব বেশি করে তিন কি চার ডিগ্রি। কথা বললেই মুখে ধোঁয়া। দাঁত বাজাতে বাজাতে গাড়ি থেকে নেমে আমরা ছুটলাম বাড়িটার দিকে।

হোটেল তো নয়ই, সাইনবোর্ড মারা গেস্টহাউজও নয়। নিতান্তই ছিমছাম একটা বাড়ি। বাড়ির মালিক দুটি ভূটানি ভাই ও তাদের তিনবোন। পাঁচজনেই অল্পবয়সি যুবক-যুবতী। তারা নিজেরা একতলায় থাকে আর দোতলার তিনটে ঘরে অতিথিদের থাকতে দেয়। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রাখলাম। ব্যবস্থা বেশ ভাল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এই ন'হাজার আটশ ফুট উঁচুতে আমাদের আলোচনার বিষয় একটাই — ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। এখন জুতো খুলব কিনা, গিজারটা ঠিক চলবে কিনা, ঘরের আলোগুলো জ্বেলে রাখব কিনা, দেওয়ালের দিকে শোব কিনা, লেপের ওপর কম্বল নাকি

কম্বলের ওপরে লেপ, উলের মোজাগুলো গেল কই, গ্লাভস আনতে কে ভুলেছে, ঠাণ্ডার অজুহাতে জমিয়ে মদ্যপান করে নেওয়া যায় কিনা, সকালে উঠে প্রকৃতির ডাক শোনা আদৌ সম্ভব হবে কিনা এইসব নিয়েই চাপা শোরগোল করতে করতে আমরা ছুটলাম রান্নাঘরের দিকে।

রান্নাঘরে ছোটার কারণ, বড় উনুন। তার চারিদিকে সকলে খেতে-পাই-না-পাই-আয়-ভাই-তাপাই বলে বসে পড়লাম। খেতেও অবশ্য পেলাম। ভাত, সুস্বাদু ডাল, আলুর তরকারি, মাছ। চুক্তির সময় জি-ওয়ান আমাদের দুবেলা মুরগি খাওয়াবার কথা দিয়েছিল বটে, তবে এখন সে বলল, "ইশ ইলাকে মে চিকিন ক্যায়শে লাউঙ্গা? চিকিনকে পিশে পিশে ভাগকর পকরু ক্যায়া?" বলে দেখি তার দাঁত বেরিয়ে ছোট চোখ আরও ছোট হয়ে গিয়ে একাকার কাণ্ড।

আমরা বুদ্ধি করে চুংথাং থেকে বেশ কিছু ডিম কিনে এনেছিলাম। তাই একটা করে ডিমসেদ্ধও পাতে পড়ল। ওই ঠাণ্ডায় ওরকম গরম খাবার মানেই তৃপ্তির শেষকথা বলা হয়ে যায়। বেশ তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলাম, কিন্তু শেষের দিকে গতি যেন একটু কমে গেল। একটা আতঙ্ক ক্রমশ চেপে বসতে লাগল। হাত ধুতে হবে! একে একে সবাই গেল কিন্তু আমি নড়লাম না। শেষে যখন না গিয়ে উপায় নেই, বাধ্য হয়ে উঠে গেলাম। বাড়ির ছোটবোন মিষ্টি হেসে আমার হাতে জলের জগ তুলে দিল। সেটা হাতে ঢালতে পরম তৃপ্তি! জলটা ওরা গরম করে দিয়েছিল। পান করার জন্যও জল অল্প গরম করে দিল ওরা। উষ্ণ অভ্যর্থনা তো একেই বলে। হাসিমুখে সকলে ঘুমোতে গেলাম।

ভোর চারটেয় জি-ওয়ান চেঁচামেচি করে আমাদেরকে তুলে ছাড়ল। সে আগেই বলে রেখেছিল যে নানা কারণে যত ভোরে বেরোব ততই ভাল। সাড়ে চারটেয় গাড়ি চড়ে বেরিয়ে পড়লাম। গন্তব্য আমাদের অতি আকাঙ্খিত গুরুদোংমার লেক। দূরত্ব সত্তর কিলোমিটার। মালপত্র ঘরেই রেখে গেলাম। হিসেব করে দেখা গেল যে আমরা বারোটার মধ্যেই এখানে ফিরে আসব। তখন মধ্যাহ্নভোজ সেরে সামান্য বিশ্রামের পর চলে যাব লাচুং।

বলাই বাহুল্য এই ভোরে ঠাণ্ডার প্রকোপ আরও বেশি। এত ঠাণ্ডাতেও যে মানুষ বাস করে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তবে জি-ওয়ান বলল এদিকে এখনও মরশুমের বরফ পড়া শুরু হয়নি।

কাঁচা ঘুম ভেঙে এই ঠাণ্ডায় জবুথবু হয়ে কাঁহাতক জেগে থাকা যায়? তাই একটু-আধটু কথাবার্তার পর সকলেরই রামঢুলুনি শুরু হল। হঠাৎ খেয়াল হল আমাদের ঘুমের সঙ্গে জি-ওয়ানও তাল মেলালে অচিরেই সে রা-ওয়ান হয়ে উঠবে। ওর আবার চোখের সাইজ দেখে বোঝবার জো নেই ঘুমোচ্ছে নাকি জেগে আছে। তাই ওর সঙ্গে গল্প শুরু করলাম। ওর কাছেই জানলাম যে সিকিমে উৎসবে অনুষ্ঠানে কথায় কথায় জুয়ো খেলাটা একটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এমনকি এই যে মহিন্দ্রা ম্যাক্স গাড়িতে বসে আমরা চলেছি সেটার মালিক ও নিজেই। জুয়ো খেলেই বাগিয়েছে।

রাস্তা ভয়ানক খারাপ। ভূমিকম্পের পরে এই পথের ছিটেফোঁটাও উন্নতি হয়নি। সিট আর গাড়ির ছাদ নরম তাই রক্ষে। জিওয়ানের হাতও বেশ পাকা। তবুও মাঝে মাঝেই আমাদের শরীরটা তালগোল পাকিয়ে যেতে চাইছিল। চারিদিক একেবারেই নিঃশব্দ। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই। হেডলাইটে রাস্তার অন্ধকার কেটে গাড়ি এগোচ্ছে। হঠাৎই একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার নজরে এল। হেডলাইটের উজ্জ্বল কানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আলোর মধ্যে বেশ কিছু সাদা দানাকে এদিক ওদিক ছুটে পালাতে দেখলাম। চিনচিনে উত্তেজনা নিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল। ওগুলো বরফের গুঁড়ো। জি-ওয়ানের কথায় পুরোটা বুঝলাম। কাল রাতেই এই অঞ্চলে মরশুমের প্রথম বরফ পড়েছে। এখন অল্প হাওয়ায় বরফের অতিমিহি কুচিগুলো এদিক-ওদিক উড়ছে। শুনে মনে শিশুর মত আনন্দ হল। আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হতে আবছা আলোয় চারিদিক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যেখানেই একটু উঁচু সেখানেই সাদা পাউডারে ভরে গিয়েছে। খুব পুরু নয়, কিন্তু আঙুল বুলিয়ে দাগ কাটার পক্ষে যথেষ্ট। সকালের নীলাভ আলোয় সেই সাদা আরও যেন মোলায়েম। আমরা হাঁ করে দেখছি আর যে যেমন পারছি বিশেষণে ভূষিত করছি। আমাদের সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানি ছিল। কলকাতায় সে খুব ছোট একটা হোটেল চালায়, নিজেই রান্নাবান্না করে। জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে ঘুরতে এল। সে ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ জেগে

উঠে বলল, “কে রে ভাই, যেখানে পেরেছে আটা ফেলতে ফেলতে গেছে?” আমরা একচোট হেসে বললাম, “আটা নয়।” তখন বলল, “এলাকায় আজ খেলা-টেলা আছে নাকি? এত চুন ছড়াবার দরকারটা কী?”

আটত্রিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সাড়ে ছটা নাগাদ পৌঁছলাম থাঙ্গু। গুরুদোংমার যাবার আগের দিন এখানেও কেউ কেউ থাকেন। এরপরে আর জনবসতি নেই। সেখান থেকে শুরু হয়েছে চোপতা ভ্যালি।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম এই ঠান্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। ছবি তোলাটাও অসম্ভব। তবে সেটা মিলিটারিদের নিষেধ আছে বলে। চীন সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরে নেই আমরা। একটু আগেই একটা সেনা ছাউনিতে দুটো বফর্স কামান দেখেছি চীনের দিকে মুখ করে বসানো।

তেরো হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত ছবির মত সুন্দর এই ছোট্ট নীলাভ থাঙ্গু গ্রাম এখন অনেকটাই বরফে মোড়া। জি-ওয়ান নিয়ে গেল সামনেই একটা কুঁড়ে ঘরে। ভেতরে ঢুকে অবশ্য আর কুঁড়ে ঘর মনে হল না। বাসন-কোসন, বিছানা বেশ পরিপাটি। সেখানে ক্যাটরিনা কাইফ আর বিদ্যা বালানের নেপালি সংস্করণ বসে আছে। ঘরের মাঝখানের একটা উনুনে কি সমস্ত রান্না হচ্ছে। উনুন পেয়েই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সোয়েটার-জিন্স-নাইকি জুতো পরা সুন্দরী মেয়েদুটির একজন ঘর গোছাতে আর একজন আমাদের জন্য জলখাবার তৈরি করতে লেগে পড়ল। জেলি দিয়ে মাখানো ভীষণ নরম আর গরম পাউরুটি খেতে খেতে প্রাণ ভরে আগুন সেঁকলাম। মন বলল এখানেই থেকে যাই। কে বেরোয় ওই ঠাণ্ডায়!

বেরোতে তো হলই, চরম ঠাণ্ডায় জড়সড় হয়ে গাড়িতে বসতেও হল। সতের হাজার আটশো ফুট উঁচুতে গুরুদোংমার লেকে গিয়ে আমাদের কী অবস্থা হবে কল্পনা করতে পারলাম না। সেখানে নাকি অক্সিজেনের অভাব, তাই বেশিক্ষণ থাকা চলবে না।

একটু পরেই আমরা যে জায়গায় এসে পড়লাম সেখানকার চারিদিক ঘিরে রেখেছে শুধুই অপার বিস্ময়। এই হল চোপতা উপত্যকা। বেশ শুকনো প্রায় সমতল জায়গা। অনেক পাথর আর সাদা বালিতে ভরা। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। পাখির পা-ও নেই। পাশ দিয়ে একটা খুব সরু নদী বয়ে গেছে বটে তবুও এ যেন খুব ঠাণ্ডা একটা মরুভূমি। বিস্তর ফাঁকা সমতলটাকে ঘিরে রয়েছে বেশ কয়েকটা উঁচু টিলা। তাদের কোনোটার রং বাদামি, কোনোটা ধূসর, আবার কোনোটা দেখে মনে হচ্ছে কাঠ দিয়ে বানিয়ে পালিশ করে নেওয়া হয়েছে। সেই কেঠো টিলার কোথাও সবুজ, কোথাও লাল ছোপ ধরেছে। কোনোটায় বিক্ষিপ্ত বরফ পড়েছে, কোনোটায় কুলফি মালাই চলকে পড়তে গিয়ে থেমে গেছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে আকাশ। আকাশের রং নীল হয় কে না জানে। কিন্তু কজনই বা জানে সেই নীল এতটাও ঘন আর এতটাও গভীর হয়! মাথার ওপরে গভীর সমুদ্রে নীলের চাষ হচ্ছে। এই বিশাল বড় আকাশটায় প্রথমদিকে একসুতোও মেঘ দেখা গেল না। এদিক-ওদিক কেউ নেই দেখে কয়েকটা মেঘ আকাশ ছেড়ে মাত্র চার পাঁচ ফুট লম্বা পেঁজা তুলো হয়ে টিলার পেট কামড়ে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে। খুব ইচ্ছে হল দৌড়ে গিয়ে গুটিকয়েক মেঘ হাতে গুটিয়ে পকেটে পুরে নিই, ইচ্ছে হল কাঠ-রঙা টিলাটার মাথায় উঠে পিছলে নামি, ইচ্ছে হল টিলার মাথার বরফগুঁড়ো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে আসি কিংবা মালাই-বরফ চেখে দেখি। কিন্তু গাড়ি থেকে নামব বললেই নামা যাবে না। শরীরের জায়গায় জায়গায় ঠাণ্ডা কোপ বসাচ্ছে, তাছাড়া আমাদের গন্তব্যে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। অসম্ভব নিস্তব্ধ এই জনমানবহীন ফাঁকা জায়গায় রাস্তা বলে কিছু নেই। মিলিটারি ট্রাকের চাকার দাগ ধরে আন্দাজে এগোতে হয়। কিছু কিছু জায়গায় মাইন পোঁতা আছে বলে সাবধান করা রয়েছে। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আমাদের ছাড়া আর কোনও টুরিস্টের গাড়িই নজরে পড়ল না। তাই মাঝে মাঝেই পথ হারালাম কিনা সেই ভাবনা হচ্ছে।

পথ যে হারাইনি সেটা একটু পরে একটা তিব্বতি মন্দিরের মত ঘর আর রঙবেরঙের রাশি রাশি পতাকা দেখে বুঝতে পারলাম। সকাল নটার রোদ একটু উষ্ণতা দেবার নাছোড়বান্দা চেষ্টা চালিয়ে হেরে ভূত হচ্ছে। গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াতেই যে ঠাণ্ডাটা কামড়াল সেটা একটা মানুষকে মুহূর্তে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সেই ঠাণ্ডাও সেই মুহূর্তে উপেক্ষিত হল। চোখের

সামনেই ধরা দিল অতি পবিত্র গুরুদোংমার লেক। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা এই ছোট্ট সরোবরের তিন-চতুর্থাংশ জমে সাদা হয়ে গেছে। বাকি জলটুকুতে উলটোদিকের বরফ-পাহাড়ের প্রতিবিম্ব আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলেছে। সেই পাহাড়ের কাঁখে সূর্য চোখ ধাঁধাচ্ছে। চিরশান্ত এই সরোবরের দিকে তাকাতেই মন তার আরও কাছে যাবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। খান পঁচিশেক সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সিঁড়ির রেলিঙে সার সার বৌদ্ধ-পতাকা লাগানো। আমাদের দেখেই পাশের ঘর থেকে একজন জওয়ান বেরিয়ে এলেন। জওয়ান জি-ওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কজন এসেছি। জি-ওয়ান মোট ছজন বলাতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে দেখলেন একজন কম। এদিক-ওদিক চাইতে দেখতে পেলেন সেই একজন ক্যামেরা হাতে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে উদ্ভ্রান্তের মত সরোবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে জানালেন পবিত্র লেকের জল ছোঁবার কোনও চেষ্টা যেন না করি। আমি হাত উঠিয়ে ঠিক আছে জানিয়ে ফটাফট কয়েকটা ছবি তুলে ভাবলাম লেকের চারিদিকটা একবার ঘুরে এলে কেমন হয়, ছোট লেক তো। এই ভেবে লেকের পাড় ধরে হাঁটা লাগিয়েছি, সেই জওয়ান আবার চেঁচিয়ে ডাকলেন। এবার তাঁর ডাক শুনে বুঝলাম বেশ রেগে গেছেন। অগত্যা ফিরে চললাম। ওই কটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে মনে হল পঞ্চাশ তলা বাড়ির সিঁড়ি ভাঙলাম। আমাকে প্রচণ্ড জোরে হাঁপাতে দেখে আমার এক সঙ্গী তড়িঘড়ি একটা কাগজের পুরিয়া ধরাল যাতে আছে কর্পূর। সেটা শুঁকতে হাঁফ একটু যেন কমল। মনে পড়ল এই উচ্চতায় এখানে শ্বাসকষ্ট হবারই কথা। দ্রুতগতিতে ওঠানামা তো একেবারেই করা উচিত নয়। মিলিটারিবাবু বেশ একটু ধমকালেন। ভাবলাম এই বুঝি দিলেন বন্দুকের একটা কোঁৎকা। বললেন ওই লেক পুরোটা ঘুরে আসতে তাঁদেরই ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে।

তাকিয়ে দেখলাম আমার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা আমাদের সেই হিন্দুস্থানি সঙ্গীর। তবে আমার মত সিঁড়ি দিয়ে সে নামেনি। গাড়ি থেকে নামার পরেই তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমার প্রাপ্তি হয়েছিল সরোবরের সৌন্দর্যকে তিন আঙুল দূর থেকে উপভোগ আর ওয়ালপেপারের মতো কিছু ছবি। যেটা পাইনি সেটা হল একথালা কাজু, কিসমিস আর বিস্কিট। আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই মিলিটারিবাবু সকলের জন্য নিয়ে এসেছিলেন, যাতে কারুর শরীর খারাপ না করে। আমি উঠে এসে দেখি থালা ফাঁকা!

যতই কষ্ট হোক, এই পবিত্রতা আর নিস্তব্ধতা ছেড়ে মন কিছুতেই যেতে চায় না। ঈশ্বর এখানে না থেকে পারেন না। গুরুদোংমার মানেই তো 'তুমি ভগবানের কাছে'। গুরু নানক নাকি এখানে পাহাড়ে পা ঝুলিয়ে বসেন। মনে হচ্ছে ওই বরফ-পাহাড়ের ওপারে বসে নিশ্চয়ই মহাদেব ধ্যান করছেন, একবার উঁকি মেরে দেখলে হত। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে মিলিটারিবাবু আমাদের আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে দিতে রাজি নন। অগত্যা আমরা ওই সামান্য সময়ের মধুর স্মৃতি নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। এমন স্মৃতি যা বাকি জীবনের জন্য মনে স্থায়ী বসবাস শুরু করে দিল। এত কষ্ট করে প্রায় আঠের হাজার ফুট উঁচুতে এই জায়গায় জীবনে হয়ত একবারই আসা যায়।

হাঁপাতে হাঁপাতে আর ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এসে পড়লাম সেই স্বর্গীয় মরুভূমিতে। যাবার পথে এই অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিলাম যে ছবি তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই এখন ফেরার পথে একবার করে গাড়ির কাচ নামিয়ে ক্যামেরা বের করে ছবি তুলেই আবার কাচ তুলে দিচ্ছি। একটা ঈষৎ সবুজ টিলার দিকে তাকিয়ে ভারী অবাক হলাম। টিলার গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আটকে রয়েছে কয়েকশো কালো জোঁক! প্রতিটি জোঁকের মুখের কাছটা সামান্য নড়ছেও। এই অবাক করা দৃশ্যের প্রতি আরও মনোযোগী হতেই আসল ব্যাপার পরিষ্কার হল। ওগুলো জোঁক নয়, চমরি গাই। এত দূর থেকে জোঁকই মনে হচ্ছে বটে! যথারীতি গাড়ির কাচ নামালাম। দৃশ্যটা ক্যামেরার ফ্রেমে এনে ফোকাস করে গ্লাভস পরা হাতে শাটার টিপতেই বোম ফাটার আওয়াজ হল। ক্যামেরাটা হাত থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। ভয়ে ভয়ে সেটা নিয়ে দেখলাম অক্ষতই আছে। তাহলে কী ফাটল? গোলাগুলি চলল নাকি!

আসলে যেটা হয়েছে গোলাগুলি বুঝি তার চেয়েও ভাল। আমাদের গাড়ির সেই কুখ্যাত চাকার টিউব ফেটে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে কপাল চাপড়ানো, টুপি খুলে চুল জাপটে ধরা, চাকায় লাথি, তালুতে ঘুষি, গাড়িতে কিল প্রভৃতি যতরকম হতাশা দেখানোর উপায় আছে সবই আমরা একে একে সেরে ফেললাম। শুধু জি-ওয়ান একটাই কথা বলে চলল, "অগর পতা হোতা কে হাম

আকেলা হ্যায়, অওর কোই টুরিশ কার নহি হ্যায়, তো ম্যায় কভি নহি আতা।" আসলে ওরা এই ধরণের বিপদে পড়লে অন্য টুরিস্টের গাড়ি থেকে চাকা দেওয়া-নেওয়া করে নেয়।

এই ভয়ংকর সুন্দর মরুভূমিতে আমাদের হাহুতাশ শোনার কেউ নেই। একমাত্র উপায় হল সেনাবাহিনীর কাছে সাহায্য চাওয়া। কিন্তু সেনা ছাউনিও এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। এই ঠাণ্ডায় হেঁটে যাওয়া মৃত্যুর সামিল। তাই আমাদেরকে নিয়ে জি-ওয়ান ওই ফাটা চাকাতেই খুব ধীরগতিতে গাড়ি চালিয়ে দিল। ক্রমশ চাকার ধাতব রিম টায়ারটাকে ফালা ফালা করে কেটে ফেলতে লাগল। আমাদের তখন গুরুদোংমার-কিসমিস-টিলা-মেঘ-জোঁক-চমরি সব মাথায় উঠেছে।

টানা একনম্বর গিয়ারে চালানোর ফলে গাড়ির ক্লাচপ্লেটের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। সেই শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত আমরা ছ'জন ডিজেল পোড়ার গন্ধে মাত হয়ে ধোঁয়ায় চোখ জ্বালাচ্ছি। কিছুদূর এইভাবে যেতে একটু দূরেই সেনা ছাউনি নজরে এল। গাড়ি ছ'জনের ভার আর বইতে নারাজ। আমরা পাঁচজনে নেমে পড়লাম। জি-ওয়ান গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল। কয়েক পা হাঁটতেই বুঝলাম এই ঠাণ্ডায় হাঁটা কী দুঃসাধ্য কাজ। এদিকে আবার এত ঠাণ্ডার মধ্যেও হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পর পর দুটো সেনা ছাউনি নজরে এল। একটা খুবই ছোট আর একটা বেশ বড়। আমরা ছোটটার পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম বড়টাকে লক্ষ করে। গেঞ্জির ওপরে কটস-উলের জামার ওপরে এমনি জামার ওপরে ফুলহাতা সোয়েটারের ওপরে ভারী জ্যাকেটের ওপরে মোটা চাদর জড়িয়ে আছি, অথচ মনে হচ্ছে যেন আমি কৌপীন ছাড়া আর কিছুই পরে নেই। শরীর হাঁফাচ্ছে, পা আর চলতে চাইছেই না, একটু উষ্ণতার জন্য আমরা মরিয়া। লেকের ওখানে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার অবস্থাই এখন সবচেয়ে খারাপ। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে বাঁদিকের ছোট সেনাছাউনি থেকে একজন জওয়ান ডাকলেন একটু চা খেয়ে যাবার জন্য। আমাদের গতিপথ সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে ঘুরে গেল।

ছাউনিতে একটা ঘুপচি ঘরে চার-পাঁচজন জওয়ান একটা তক্তপোশে বসে হিটারের আগুনে শরীর সেঁকছেন। আমাদেরকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বসার জায়গা দিলেন। ডাঁই করে শোয়ানো কয়েকটা বন্দুকের পাশে বসে আমরা তখন শরীরটাকে হিটারের ওপরে ঝুলিয়ে নবজীবন লাভ করছি। বিকিরীত তাপকে একত্রিত করার জন্যে জওয়ানরা তড়িঘড়ি একটা মোটা তোয়ালে দিলেন।

সেইটায় নিজেকে ঘিরে বসল আমাদের হিন্দুস্থানি সঙ্গীটি। স্টোভে জব্বর পাম্প দিতে দিতে আর এ অঞ্চলে স্টোভ খোঁচাবার পিনের অভাবের কথা জানাতে জানাতে জওয়ানরা আমাদের খুব সুস্বাদু চা তৈরি করে খেতে দিলেন। তাঁদের মধ্যে এক-একজন ভারতের এক-এক প্রান্ত থেকে এসেছেন। ভিটেমাটি, সংসার সব ছেড়ে চাকরি ও দেশরক্ষার স্বার্থে দেশের সীমান্তে নিজের জীবন বিপন্ন করে দিনের পর দিন কাটানোরর এই সংগ্রামকে কুর্ণিশ না করে থাকা যায় না। মিনিট কুড়ি কাটানোর পরে শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় জওয়ানদের বুকে জড়িয়ে বিদায় নিলাম। তবে আমাদের বন্ধুটি তোয়ালে কিছুতেই ছাড়ল না। বলল সামনের বড় ছাউনিতে দিয়ে দেবে।

মাত্র তিনশো মিটার দূরেই পরের সেনা ছাউনি। তার পাশে পৌঁছে দেখি আমাদের গাড়িও হাজির। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উঠে বসলাম। গাড়ির ইঞ্জিন চলছে, একবার বন্ধ করলে আবার চালানো মুশকিল। ফলে গাড়ির ভেতরটা গরম হওয়াতে খুব সামান্য হলেও আরাম লাগছিল। চাকা না পালটে গাড়ি আর চালানো অসম্ভব। ধোঁয়ায় আর চিন্তায় জি-ওয়ানের ফর্সা মুখটা কেলে-কুচ্ছিত হয়ে গেছে। মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে তিনজন জওয়ানকে আগুন জ্বালিয়ে পোহাতে দেখে জি-ওয়ান গাড়ি ছেড়ে সেদিকে দৌড় দিল। আমাদের বেশ রাগ হল। টুরিস্টদের বিপদে ফেলে রেখে নিজে আগুন পোহাতে যাওয়া! কিন্তু পরক্ষণেই সে ছুটে ছুটে ফিরে এল। হাতে একটা জ্বলন্ত কাঠ। সেটা নিয়ে সে গাড়ির নিচে ঢুকে গেল। বুঝলাম তেলের পাইপ ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, তাই তাকে গরম করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে ওই তিনজনের কাছে গিয়ে সমস্যাটা জানালাম। হাওয়া ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রত্যেকেই তোতলাতে শুরু করেছি। আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে ওঁরা বললেন একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই বলে হঠাৎই তাঁরা উশখুশ করতে লাগলেন ও ছাউনিতে দৌড়ে ঢুকে পড়লেন। আমি একজনের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে অনুনয় করলাম। তিনি বললেন তাঁদের অফিসার এসে গেছেন, একটা মিটিং হবে, তারপর তাঁকে আমাদের কথা জানানো হবে। ততক্ষণ আমাদেরকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ছাউনি থেকে অনেকজন সেনা বেরিয়ে এল। সুদর্শন যুবক অফিসারকে আসতে দেখলাম। সকলে মিলে তাঁকে স্যালুট করল ও তারপরে একটা পতাকার চারিদিকে সবাই শরীর সোজা করে পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল। আমাদের অপেক্ষা চলতে লাগল, কিন্তু মনে হল ওই ঠাণ্ডায় মৃত্যু আসতে বেশি দেরি নেই। ইতমধ্যেই আমাদের দুজন সঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি অবশ্য তাদেরকে আর একটু বেশিই অসুস্থ হবার ভান করতে বললাম।

জওয়ানদের মিটিং চলাকালীন বিরক্ত করা ঠিক নয় জানি। কিন্তু আমরা তখন বাঁচতে চাই। তাঁদের শীতের ইউনিফর্ম লেপের মত মোটা, তাছাড়া তাঁরা ঠাণ্ডায় কিছুটা অভ্যস্থ। তাই হয়ত আমাদের কষ্টটা তাঁরা পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। সাহসে ভর করে আমি তাঁদের জটলার পাশে গিয়ে দুহাত তুললাম। সুদর্শন অফিসার ভ্রূ কুঁচকে এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে আমার হাতদুটো বুকের কাছে নেমে এসে নমস্কার জানাচ্ছে। প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে তাঁর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলাম। অফিসার আমার হাত ধরে আশ্বস্ত করলেন। বললেন আমাদেরকে বাঁচানো তাঁদের কর্তব্য, আমরা যেন চিন্তা না করি। বললাম আমাদেরকে অন্তত থাঙ্গু অবধি পৌঁছে দিলেও চলবে। তিনি বললেন আমরা যেন তাঁদের এখানে লাঞ্চটা করি এবং তারপর তাঁরা আমাদেরকে পৌঁছে দেবেন।

সেনাবাহিনীর খাবারঘরে নিজেকেই খাবার নিয়ে, খেয়ে, বাসন ধুয়ে রাখতে হয়। কিন্তু আমাদেরকে খাবার এনে দিলেন তাঁরা। সেই ডাল আর মোটা রুটি তখন আমাদের কাছে অমৃত মনে হলেও পরে বুঝেছিলাম ওর চেয়ে খারাপ রান্না আর হতে পারে না। খাওয়া শেষে বাসনও ধুতে দিলেন না। গরম জলে আঁচানো হলে তাঁরা আমাদের নিয়ে একটা ঢাকা দেওয়া জিপসিতে উঠলেন। বললেন সেখান থেকে থাঙ্গু পৌঁছে দেবেন। জি-ওয়ানের গাড়ির স্টেপনিতে হাওয়া ভরে দেবেন যাতে সে সেটা নিয়ে থাঙ্গু পৌঁছতে পারে।

জিপসিতে দুজন জওয়ান ছিলেন। তাঁরা বললেন সেই মুহূর্তে তাপমাত্রা শূণ্যের দশ ডিগ্রি নিচে। রাত্রে আরও ছয় ডিগ্রি কমে যাবে। এই ঠাণ্ডায় সাধারণত টুরিস্ট আসেন না। চরম ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে থাঙ্গু পৌঁছতে আমাদের ধড়ে এক পোয়া প্রাণ এল। সেখানে নেমে কী করব ভাবছি, জওয়ান দুজনকে বিদায় জানাতে দেরি করছি, এমন সময় সেই পথেই একটা মিলিটারি ট্রাক এল।

সামনে দুজন বসে, পেছনটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। তার যাবার পথে ছাতেন পড়বে। আমরা অনুরোধ করলাম সেই ট্রাকে আমাদেরকে পৌঁছে দিতে। ওঁরা রাজি হয়ে গেলেন।

ট্রাকের পেছনে উঠেই বুঝলাম এটা যাত্রীবাহি ট্রাক নয়, মালবাহী ট্রাক। অর্থাৎ যাত্রীদের জন্য সুযোগ-সুবিধের ছিটেফোঁটাও নেই। একটা লোহার ভাঙা ফোল্ডিং বেঞ্চ আর একটা টায়ারের কানায় পাঁচজনে ভাগাভাগি করে বসলাম। ট্রাক চলতেই শুরু হল আমাদের নরকযন্ত্রণা। থাঙ্গু থেকে ছাতেনের রাস্তা যে কী ভীষণ বাজে সেটা আগেই বলেছি। চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা ও পশ্চাদ্দেশ প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টার সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল মিলিটারি ডাল-রুটির অম্বল-ঢেকুর। বেশ কয়েকবার মাথা ঠুকল, হাত ছড়ল। চারিদিক ত্রিপলে ঢাকা অন্ধকারে বসে ত্রিপলের ফুটোগুলোকে তারা ভাবতে লাগলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়েছে আর নয়, এবার নেমে হেঁটেই যাব।

অবশেষে বিকেল চারটেয় আমাদের দুর্বিষহ যাত্রা শেষ হল। ছাতেনে আমরা যেখানে উঠেছিলাম সেখানে ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে যুধিষ্ঠির মনে হচ্ছে -- নরকের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে এসে পৌঁছলাম। সামনে বসা জওয়ান দুজন আমাদেরকে বিদায় জানাতে এলেন। তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে কৃতজ্ঞতায় আমাদের চোখে জল চলে এল। এতদিন ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্বন্ধে কতই না বিরূপ ধারণা পোষণ করেছি। এই গুরুদোংমার লেকে না এলে তাঁদেরকে কি ভগবান বলে ভাবতে পারতাম? অগণিত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য তাঁরা যা করেছেন ও করে চলেছেন তার জন্য কোনও প্রশংসা কোনও পুরস্কারই যথেষ্ট নয়। জয় গুরুদোংমার! জয় হিন্দ!

কোমল বিদ্রোহ

সৌরভ দাস

ছেলেটা মানতে পারেনি-
মানুষের দাম সিগারেটের মতো,
শুরুর আগে যত্ন খুব
জ্বলার শেষে মৃত-
মানতে পারেনি।

তাই পর্বতশিখরে চেঁচিয়ে বলেছে - "এটা হতে পারেনা।"
পাহাড় ওকে ঠেলে ফেলেছে খাদে,
সেখানে একই দাবী জানাতে
ভূমিকম্প এসেছে হঠাৎ-
টেনে নিয়েছে মাটির আরও নিচে,
ইঁদুররাও রাখেনি কোনও সংস্রব তার সাথে।

এদিকে নিখোঁজ ছেলেটা
মাটির ওপরের জগতে তখন
রীতিমতো বিখ্যাত, শহীদ -
একদল বলে ও আমাদের
অন্যদল বলে এর একটা বিহিত
করতেই হবে।

নিখোঁজ ছেলেটা এসবের কিছুই জানে না।
ইঁদুরের রাজত্বে শুয়ে শুয়ে কিসব ভাবে!
সিগারেট ধরায়, ফিল্টারগুলো যত্ন করে রাখে, আর-
স্বপ্ন দেখে- তার পুরনো ভালোবাসা
বোকাগুলোর গালে থাপ্পড় মেরে বলছে
"ইডিয়ট, ও শহীদ-টহিদ নয়,
ব্লাডি ইমোশানাল -
ভালবাসার কাঙাল।"

রামুর বাঘ

অনুভব বক্সি

রামুর বাঘকে নিয়ে
রং- তুলি দিয়ে ছবি আঁকে এক আঁকিয়ে,
ইয়া বড় বুনো বাঘ কটমট তাকিয়ে;
বড় বড় গোঁফ তার- দাঁত আছে বেরিয়ে-
পড় যদি সামনেতে যাবে কোথা পালিয়ে!
ছবি আঁকা শেষ প্রায়- এমনই সময়ে
বাঘ আসে বেরিয়ে- সে রং তুলি ছড়িয়ে।
আঁকিয়ে তো চেঁচিয়ে; ঘরদোর ছাড়িয়ে
বুনো বাঘ ছুটে চলে তার'ই পিছু তাড়িয়ে।
তাই দেখে পুলিশেরা পড়ে সেথা দাঁড়িয়ে-
বাঘ তাই লেজ তুলে গলা'খানি ফুলিয়ে
গর্জায় জোরে জোরে, দেখে-শুনে ঘাবড়িয়ে
পুলিশেরা হঠে যায়, রামু যায় এগিয়ে।
একখানা বড় মাংসের টোপ দেখিয়ে
নিয়ে চলে বাঘটাকে কোনোমতে ভুলিয়ে।
বাঘটাকে পেয়ে সে রাখে পোষ মানিয়ে-
ঘুরে আসে মাঝে মাঝে শহরটা পেরিয়ে।
ভাবছ কি? আমি বলি বেশি বাড়িয়ে?
চলে এস একদিন, দেব'খনে দেখিয়ে।

অসুখ পুষি অবসরে

নবকলম

নিজের ছায়াকেও ভয় পায় এখন যতো ‘ক্যালকেশিয়ান’,
শখের সিজোফ্রেনিক অবসরে আমরা সবাই ।।

রাজা সাজার পোশাক পড়ে আলনায়
ধুলো মাখা , বহুদিন ধরে মুড নেই ,

হনুমানের মুখোশের চোখের ফাঁকটুকু জুড়ে
জমে আছে মাকড়শার জাল , ঠুলি ।।

হেলায় পড়ে ঘরের কোনে ফকির সাজার দাড়ি – টুপি ;
ওসব পুরনো, টানে না আজকে বিশেষ ।।

রেডিওয় বলেছে অসুখের চাষে লাভের অঙ্ক বড় ,
দানা-পানি দিয়ে ভয়ের রোগ -ই পুষি ।।
সূর্য উঠলে জানলায় রাখি পেঁচা , লুকোই পিছনে ;
পূর্ণিমার চাঁদ দেখে বলি “আলোক -হারাম” ,
করি গালমন্দ যতো খুশি ।।

এখন ছুঁয়ে দেখিনা বিয়েবাড়ি , জন্মদিনের পিঠে- পায়েস ,
কালিয়া -পোলাও ;
বিষ মিশে আছে ভেবে বেড়াল কে দিই ।।

খবরের কাগজ পড়ে ঘুমের বড়ি হাতড়াই
পাঞ্জাবির পকেটে ,
বালিশের খোল কোটি -কোটি , তাঁবু হয়ে কালাহারি জুড়ে ।।
“স্মৃতির উদ্দেশ্যে” -র পাতায় আমার ছবি দেখি যেন ,
দৈনিকগুলো কে হুমকির পাহাড় মনে হয় ।।

গান-কবিতা-নাটক – যাবতীয় নান্দনিক অপমান
বুকে এঁটে বসে ত্রিশূলের মতো ,
দগদগে হয় আরও ত্রিফলার ক্ষত ।।

বল দেখি , পালাবার পথ কই ?
আছে কিছু? আমাদের কিসু নেই -
না আছে ম্যানহোল – শ্যাম-সেতু ,
না সড়কপথ ,
মেরে মাছ নিজে বাঁচো , সেই বাঁধা গত ।।

অসমাপ্তি

শ্রীরূপা ঘোষ

স্বপ্নের নাম মরীচিকা,
তারাখসা লগ্নে জন্ম তার,
রাত জাগা মনের ঘরে বাস।
দিন যায় রাত পোহায় ...
তবু মেটেনা তার অপেক্ষার আশ।
অপেক্ষা ... সে যে বড়ই খামখেয়ালী;
ঝোড়ো হাওয়ার টানে
কখনও জোয়ার, কখনও বা ভাঁটার থিতিয়ে
যাওয়া কাদা।
হয়ত ভাঁটাই ভালো,
নতুন স্বপ্নবীজ বপনের সম্ভাবনা রেখে যায় ফিরে
যাওয়া ঢেউগুলো,
যেখানে মৃত অপেক্ষার কবরে জন্ম নেয় নতুন
সম্ভাবনা
আর অসমাপ্ত নতুন কোন অপেক্ষার ...

বিনা কথায়

শতরূপা ব্যানার্জী

তোকে দেখতে ইচ্ছে হলো খুব
আকাশকে তাই যেই ডেকেছি,'আয়'
লক্ষী ছেলে,এক্কেবারে চুপ
বৃষ্টি হয়ে আমায় ছুঁতে চায়।
তারপরেতে গভীর জলে ডুব,
মেঘ হাসছে আমার বারান্দায়
কোনটা ঠিক,কোনটা আবার ভুল
বিনা কথায় শব্দ বেড়ে যায়।
সময় কাটে,শহর নিঃঝুম
হঠাৎ বৃষ্টি সারা শরীর জুড়ে,
কেমন যেন মনটা এলোমেলো
হন্যে হয়ে শব্দ খুঁজে ফেরে।
শব্দ দিয়ে যেই না কথা শুরু
চমকে দেখি ঘুম ঘুম তোর চোখ
যেই কথাটা বলব বলে ভাবি,
বিনা কথায় সেই কথা শেষ হোক।

ইজিপ্সিয়ান জোয়ান মাছ

অবকাশের জন্য কিছু একটা লেখার খুব ইচ্ছে মনে, এদিকে সময় আর সুযোগ আর হয় না,শেষমেশ একটা রেসিপি নামানো গেল। সবাই ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।

এই পদটি ইজিপ্টে থায়িম পাতা এবং তেল দিয়ে রান্না হয়। থায়িম স্বাদেগন্ধে জোয়ান এর সমগোত্রীয়,ঝাঁঝ আর গন্ধে একটু কমের দিকে।

উপকরণ :

১। এক পাউন্ড মতো বোনলেস মাছের ফিলে,কিউব (ডুমো ডুমো) করে কাটা
২। এক চা চামচ জোয়ান
৩। শুকনো লঙ্কা,আদা,রসুন বাটা এক চা চামচ করে
৪। টক দই ফেটানো দুই টেবিল চামচ
৫। লেবুর রস এক টেবিল চামচ
৬। শুকনো মেথি পাতা (কসৌরি মেথি)
৭। অলিভ তেল আর নুন

পাক্ প্রণালী:

মাছ গুলো অর্ধেক বাটা মসলা,লেবুর রস,নুন দিয়ে ঘন্টা খানেক ম্যারিনেট করে নিন।

এরপরে ওই ম্যারিনেটেড মাছগুলো বাকি অর্ধেক বাটা মশলা,ফেটানো দই, জোয়ান, অলিভ তেল,কসৌরি মেথি আর নুন দিয়ে আরো ঘন্টা দুই ম্যারিনেট করে নিন।

এরপরে স্কিউঅরে গেঁথে চারকোলে বার-বি-কিউ করুন বা মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জ এ কনভেক্সন এ দিয়ে রোস্ট করে নিন। সিম্পলি নন স্টিক তাওয়াতে সামান্য তেলে ভেজে তুললেও যথেষ্ট ভালো লাগবে।

পুদিনার চাটনি আর ভিনিগারে ভেজানো পেঁয়াজ দিয়ে দারুন জমবে।

কেমন খেলেন জানাতে ভুলবেন না কিন্তু।

অপূর্ণ বিদ্যা

ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী

নীলাদ্রি একজন জাদুকর। মঞ্চের ওপর নানারকম ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে সে দর্শকদের একদম তাক লাগিয়ে দেয়। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও চড়া মেকআপে 'দ্য ম্যাজিক্যাল নীল' ছদ্মনামে সে খেলা দেখায়। ছোটবেলা থেকেই নীলাদ্রীর জাদুবিদ্যার প্রতি দারুণ আগ্রহ। স্কুলে বন্ধুদের নানারকম জাদুর খেলা দেখিয়ে সে মাত করে দিত। পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পাশ করবার পর সে ঠিক করে জাদুবিদ্যা দেখিয়েই রোজগার করবে। বাপের অঢেল পয়সা ও স্নেহ তাকে এ ব্যাপারে আরো উৎসাহী করে তোলে। বাবার অনুমতি নিয়ে সে জাদুকর হীরালালের সহকারী হিসাবে কাজ শুরু করে। হীরালালের নানারকম খেলার মধ্যে একটি বিশেষ খেলা ছিল সম্মোহন। দর্শকদের মধ্যে থেকে কিছু দর্শককে বেছে নিয়ে তাদের সম্মোহিত করে সে তাদের দিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করাতো। নীলাদ্রি হীরালালের কাছ থেকে নানারকম খেলা শিখলেও এই বিশেষ বিদ্যেটি হীরালাল তাকে শেখায়নি। শিখতে চাইলে সে হেসে বলত - "তোর এখনও এ খেলা দেখাবার মত যোগ্যতা হয়নি।" এর বছর তিনেক পর নীলাদ্রি স্বাধীন ভাবে খেলা দেখাতে শুরু করে এবং বলা বাহুল্য, প্রথম শো থেকেই সে দর্শকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। নীলাদ্রির বিশেষত্ব হল, সে চিরাচরিত হাতসাফাইয়ের খেলা ছাড়াও নিজের পদার্থবিদ্যার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক নানারকম জাদু দেখায়। মাঝে-মাঝে নীলাদ্রি নিজেও অবাক হয়ে যায়, আজকালকার এই ইন্টারনেট ও ফেসবুকের যুগেও তার জাদুর খেলা দেখবার জন্য দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে প্রায় দু'মাস ধরে শো করবার পর নীলাদ্রি ঠিক করে এবার তার কিছুদিন বিশ্রাম দরকার। কিছুদিন আগেই বন্ধু অরুণাভ তাকে বারবার তার কাছে দিনকয়েক কাটিয়ে আসার জন্য বলেছিল। অরুণাভ আজকাল কর্মসূত্রে ঘাটশিলায় রয়েছে। সে একটি বেসরকারী কোম্পানীতে উচ্চপদে চাকরি করে। এই সুযোগে কিছুদিন ঘাটশিলা থেকে ঘুরে এলে বেশ হয়, এই চিন্তা করে নীলাদ্রি অরুণাভকে ফোন করে। নীলাদ্রির গলা শুনে অরুণাভ হইহই করে ওঠে - "এতদিনে তোর সুবুদ্ধি হয়েছে। কবে আসছিস বল?"

“ভাবছি সামনের শনিবারই গিয়ে পড়ব” - উত্তর দেয় নীলাদ্রি। অরুণাভ বলে -“তাহলে এক কাজ কর, সোজা গাড়ি নিয়ে চলে আয়। ঘাটশিলায় পৌঁছে আমাকে ফোন করিস, আমি তোকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যাব।” নির্দ্দিষ্ট দিনে নীলাদ্রি অরুণাভর কোয়ার্টারে এসে ওঠে। দুদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া, সুবর্ণরেখার ধারে বেড়ানো, ফুলডুংরি আর রাকা মাইন্‌স-এ ঘোরা – এইসব করতেই কেটে যায়। সেদিন অরুণাভ সন্ধ্যেবেলায় নীলাদ্রিকে এসে বলে,“শুনলাম সুবর্ণরেখার ধারে বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি এক সাধুবাবা আস্তানা গেড়েছে। এখানকার লোকেরা তো খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। যাবি নাকি একবার দেখতে?” নীলাদ্রি উত্তর দিল, “তা গেলেই হয়, তবে তুই তো জানিসই, এসব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। তবে বলছিস যখন, চল একবার দেখেই আসি না হয়।”

সাধুবাবার চেহারাটি বেশ জম্পেশ। নদীর ধারে ধুনি জ্বালিয়ে চারপাশে নরমুন্ড সাজিয়ে বসেছেন। নীলাদ্রি ও অরুণাভ সবার পেছনে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পরেই দর্শকদের মধ্যে ওরা একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে। নীলাদ্রি ফিসফিস করে বলে ওঠে, “কি ব্যাপার বলতো?” অরুণাভ একইভাবে জবাব দেয়, “যা শুনেছি, বাবাজী নাকি নানারকম ভেল্কি দেখান। এ বোধহয় সেইরকমই কিছু একটা হবে।” “চল তো, একবার দেখে আসি।” – এই বলে অরুণাভর আপত্তি উপেক্ষা করে নীলাদ্রি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একদম বাবাজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবাজী তাঁর লাল চোখ পাকিয়ে ডান হাত নিজের মুখের চারপাশে ঘুরিয়ে একবার ওপরে তুলে হাতটা সামনে এনে মুঠো খুলতেই তাঁর হাতের তালু থেকে বেশ কিছু ফুল গড়িয়ে পড়ল। সেই ফুল নেওয়ার জন্য দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। অরুণাভ নীলাদ্রিকে বলল, “সাধুবাবা প্রায়ই এইরকম মন্ত্রঃপুত ফুল বিলি করেন। যা শুনেছি, এই ফুল পেয়ে অনেকেরই অনেক সমস্যার নাকি সমাধান হয়েছে।” এই কথা শুনে নীলাদ্রি হো হো করে হেসে উঠল। নীলাদ্রির হাসি শুনে সবার চোখ তার দিকে পড়ল। সাধুবাবা তাঁর লাল-লাল চোখে কটমট করে তার দিকে তাকালেন। নীলাদ্রি সোজা সাধুবাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, “বাবাজী, আপনার সাধনার দৌড় কি এই পর্যন্তই? এ তো আমিও পারি।” এই বলেই নীলাদ্রি তার ডানহাতটিকে ঠিক সাধুবাবার মতই ঘুরিয়ে সামনে এনে মুঠো খুলতেই তার হাতের মধ্যে

দুটো টাকার কয়েন চক্‌চক্‌ করে উঠল! দর্শকরা স্তম্ভিত। কিন্তু নীলাদ্রি থামবার পাত্র নয়। সে ওর মধ্যেই সাধুবাবার জটা থেকে দুটো ফুল টেনে বার করে বলল, "এবার বাবাজী এটা করে দেখান দেখি?" বাবাজীর মুখ থমথমে। দর্শকদের মধ্যে প্রথমে চাপা গুঞ্জন ও তারপর রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। নীলাদ্রি ঠাট্টা করে বলল, "বাবাজী, এবার কোথায় গেল আপনার সাধনা?" বাবাজী এই শুনে কটমট করে নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, "আমার সাধনার জোর তুই এখনও দেখিসনি, তবে চিন্তা করিস না, খুব শীঘ্রই তুই তা টের পাবি। আমার মঞ্চ তুই ভেস্তে দিলি, কিন্তু তুইও আর কোনোদিন মঞ্চে উঠতে পারবি না!" এই বলে তিনি তেমনি কটমট করে নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে রইলেন। নীলাদ্রিও স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। পাশ থেকে অরুণাভ ঠেলা দিল, "নীলাদ্রি, অনেক হয়েছে, বাড়ী চল।" বাড়ী ফিরে অরুণাভ রাগত ভাবে নীলাদ্রিকে বলল, "কি করলি এটা? লোকটা আর যাই হোক, কারো ক্ষতি তো করেনি।" নীলাদ্রি হাসতে হাসতে বলল, "তুই তো জানিস, আমার এইসব বুজরুকি একদম সহ্য হয় না।" অরুণাভ বলল, "সে তো বাবা তুইও মঞ্চে এইসব বুজরুকি দেখাস।" নীলাদ্রি গম্ভীর হয়ে বলল, "দ্যাখ, আমি যেটা করি, সবাই জানে যে সেটা হাতসাফাই। নিজেকে দেবতা হিসেবে আমি দেখাই না।" অরুণাভ বলল, "সে যাই বল বাবা, তুই এটা না করলেই পারতিস।" জবাবে নীলাদ্রি শুধু হাসল। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর নীলাদ্রি তার ঘরে এসে জানালাটা খুলে দিল। একটা দমকা বাতাস এসে তার শরীর মন ভরিয়ে দিল। নীলাদ্রি ঘরের আলো বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

তখন কত রাত জানা নেই, হঠাৎ নীলাদ্রির ঘুমটা ভেঙে গেল। বেশ গরম লাগছে। হাওয়াটা মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। খাট থেকে উঠে নীলাদ্রি অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঠাহর করল যে সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে করে দরজাটা খুলতেই সামনের দৃশ্যটা কেমন যেন অচেনা মনে হল। কিছুক্ষণ এ দিক ও দিক তাকাতেই তার মনে হল, সে যেন একটা বিশাল মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তার মনে হল যেন অনেকগুলো সিট খালি। তারই মধ্যে একটা সিটে কোনোরকমে বসে ডানদিকে তাকাতেই সে তার গুরু হীরালালকে দেখতে পেল। এতদিন পর দেখা হতে নীলাদ্রির

আনন্দের আর সীমা রইল না। কিন্তু হীরালালের সঙ্গে কথা বলতে গেলে নীলাদ্রি লক্ষ্য করল, হীরালাল তার কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন না। হঠাৎ করে মঞ্চের দিক থেকে তীব্র একটা আলো এসে পড়ল এবং মূহুর্তের মধ্যে চারদিকটা আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। এবার সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই তার রক্ত হিম হয়ে উঠল। হীরালাল ছাড়া বাকী সবকটা সিটেই একটি করে নরকঙ্কাল বসে আছে। এবার মঞ্চের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল সেই সন্ধ্যায় দেখা সাধুবাবাকে। সাধুবাবা একে একে তারই সবকটা খেলা দেখাতে লাগলেন এবং প্রতিটি খেলার শেষেই নরকঙ্কালদের খটাখট হাততালিতে কান পাতা দায়। হঠাৎ সাধুবাবা তার দিকে তাকালেন। চারদিকে তাকিয়ে সে দেখল, হীরালাল সহ বাকী নরকঙ্কালরাও তার দিকে তাকিয়ে আছে। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, মঞ্চের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে। মঞ্চের মধ্যে প্রায় দু'মানুষ উঁচু একটা জলভর্তি কাচের বাক্স আবির্ভূত হয়েছে। সেটা দেখেই নীলাদ্রি চিনতে পারল, এ যে তারই একটি খেলা। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীলাদ্রি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। সাধুবাবা তার দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করলেন। নীলাদ্রি বুঝতে পারল যে, সাধুবাবা তাকে তারই খেলা দেখাবার জন্য চ্যালেঞ্জ করছেন। এ খেলায় জাদুকর নিজেকে লোহার শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ঐ জলভর্তি কাচের বাক্সে ঝাঁপ দেন। তারপর দর্শকদের অবাক করে দিয়ে মিনিটখানেকের মধ্যেই শেকল খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। এটা তারই একটা খেলা বলে এই খেলার প্রতিটি কলাকৌশল আর খুঁটিনাটি নীলাদ্রি বেশ ভাল করেই জানে। নীলাদ্রি দেখল, দুটি নরকঙ্কাল তারই দুই সহকারীর মত হাতে শেকল নিয়ে বাক্সের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখে নীলাদ্রি নির্ভয়ে বাক্সটির দিকে এগিয়ে গেল। নরকঙ্কাল দুটি তার সমস্ত শরীর ভাল করে শেকল দিয়ে বেঁধে দিল। বাক্সতে নামার সময় নীলাদ্রি একঝলক সাধুবাবার দিকে তাকাতে দেখল যে, সাধুবাবা মুখে বিদ্রূপের হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। নীলাদ্রি কিছু না বলে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল আর জলের মধ্যে নেমে গেল। জলে নেমে নীলাদ্রি অভ্যস্ত ভাবে শেকলের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় চাপ দিতে লাগল। পরক্ষণেই নীলাদ্রির রক্ত হিম হয়ে গেল! এতো খেলা দেখাবার সেই নির্দ্দিষ্ট শেকল নয়! এ যে একদম শক্তপোক্ত নিরেট একটা লোহার শেকল! জলের মধ্যে থেকে আবছা ভাবে কাচের ওপারে সে সাধুবাবাকে দেখতে পেল। মনে হল, সাধুবাবা তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। নীলাদ্রি প্রাণপণে জলের ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে

লাগল। কিন্তু সারা গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঐ ভারি শেকল তাকে কিছুতেই ওপরে উঠতে দিচ্ছে না। অসহায় ভাবে নীলাদ্রি আর্তনাদ করে উঠল। স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার নাক-মুখ দিয়ে জল ঢুকে শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে আসছে। শেষবারের মত সে কাচের বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল, সাধুবাবা তার দিকে একইরকমভাবে তাকিয়ে রয়েছেন। এরপর নীলাদ্রি জ্ঞান হারাল।

নীলাদ্রি'র জ্ঞান ফিরল অরুণাভ'র বাড়ির চাকরের ডাকে। সে সকালবেলা চা দিতে এসে বাবুর বন্ধুকে অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অরুণাভ ছুটে এসে নীলাদ্রিকে জিজ্ঞেস করল, "কিরে? তোর কি হয়েছিল?" নীলাদ্রি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অরুণাভ আবার জিজ্ঞেস করতেই নীলাদ্রির ঘোর কেটে মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বেরোল, "সম্মোহন!" যে সম্মোহন নীলাদ্রিকে তার গুরু শেখাননি, আজ সে নিজেই সেই বিদ্যের শিকার হল। অরুণাভকে জবাব না দিয়ে সে ছুটে গেল সুবর্ণরেখার পাড়ে সেই সাধুবাবার কাছে। সম্মোহন বিদ্যে তাকে শিখতেই হবে। সাধুর ডেরায় গিয়ে সে দেখতে পেল, সাধুবাবা তল্পিতল্পা গুটিয়ে এ অঞ্চল ত্যাগ করেছেন।

নীলাদ্রি আজকাল জাদু দেখানো ছেড়ে দিয়েছে। সে একটি প্রাইভেট স্কুলে পদার্থবিদ্যা পড়ায়।

প্রত্যাবর্তন

অয়ন চ্যাটার্জী

১
রিহান

আকাশে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে।

হাতিরঝিলের একটা সেতুতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দৃশ্যটা দেখল রিহান। পানির বুকে ছড়িয়ে পড়ল রঙের বাহার। তরঙ্গ উঠল তার মনেও। পিছনের এক বছরের স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

রিহান ঢাকায় এসেছে একমাস আগে, চাকরি নিয়ে। এর আগের সময়টা সে কাটিয়েছে রাজশাহীতে। পড়াশোনা পুরোটাই রাজশাহীতে। এর আগে কয়েকবার ঢাকায় এসে তার নিদারুণ বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল এই নোংরা ঘিঞ্জি শহরটার প্রতি। মনে মনে ঠিক করেছিল সে ঢাকায় চাকরি করতে আসবে না। সেইমতো পড়াশুনা শেষ হতে রাজশাহীতেই চাকরি খুঁজে নিয়েছিল একটা প্রাইভেট ফার্মে। কিন্তু মাঝখানে পরিচয় হয়ে গেল লিয়ানার সাথে। ফেসবুক থেকে পরিচয় হয়ে ব্যাপারটা যখন অনেকদুর গড়িয়ে গেল, সমস্যাটা দেখা দিল এরপরেই। লিয়ানার চাহিদামত ঢাকায় আসতে হল তার, খুঁজতে হল নতুন চাকরি। শুরুতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে সে, বিজয় সরণীর পাশের একটা মেসে অনেক কষ্ট করে ছিল। লিয়ানার সান্নিধ্য তাকে কষ্ট ভুলতে সাহায্য করেছে, অবশেষে গত সপ্তাহে চাকরিটা পেয়ে গেছে সে। খুব বড় কিছু নয়, তবে বেশ ভালো একটা এনজিওর প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পদটাও খারাপ নয়। আজ লিয়ানার আসার কথা ছিল হাতিরঝিলে, দুজনে একসাথে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু লিয়ানা আসেনি।

ইদানিং কি যেন হয়েছে মেয়েটার। মনের গভীরে ভাঙনের সুর টের পাচ্ছে রিহান। সুর কেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। লিয়ানার চাহিদার সাথে পেরে ওঠার এখনো বহু বাকি রিহানের। আগে হলে

হয়তো নীরবে পিছু হটে আসতো, কিন্তু এখন আর পিছু আসা সম্ভব নয়। পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে মেয়েটার ওপরে। ওকে ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হচ্ছে।

ফুচকাওয়ালা হেঁটে গেল। ডাকতে গিয়েও সামলে নিল রিহান। লিয়ানা থাকলে ফুচকা খাওয়া একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় রিহানের। আজ কিছু ভাল লাগছে না। তিনবার কল দিয়েছে লিয়ানার ফোনে, দুইবার ব্যস্ত পেয়েছে আর শেষবার রিং ধরেনি। শেষে টেক্সট পাঠাল কিন্তু তার কোনো রিপ্লাই আসল না। ধীর পায়ে বাসার দিকে ফিরল সে।

মেসে এসে নিজের রুমে ঢুকে মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। কিছুই ভাল লাগছে না। বুকের গভীরে যেন একটা ব্যথা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। রুমমেট লিটন এখনো রুমে আসেনি। সে লাইট নিভিয়ে চোখ বন্ধ করল। এবার সে নিজের জগতে হারিয়ে যাবে।

২

লিয়ানা

বিকেলটা খুব সুন্দর কাটল আজ। অনিকের সাথে সিনেপ্লেক্সে মুভি দেখা হল, সাথে ঘোরা তো হলই। মুভিটা ছিল হরর্, যেখানে নায়ক খুন হওয়ার পরে নায়িকাকে খুন করার চেষ্টা চালায়। দেখতে দেখতে কয়েকবার জড়িয়ে ধরেছে অনিককে। অনিক আবার অনেক সাহসী। এসবে সে ভয় পায়না। ঝামেলা শুধু একটাই, রিহান ছেলেটা বিরক্ত করছে। আকারে ইঙ্গিতে সে কয়েকবার বুঝিয়ে দিয়েছে সব কিছু শেষ, কিন্তু কেন জানি না ছেলেটা বুঝতে পারেনা বা বুঝেও না বোঝার ভান করে! অসহ্য! তবু এখনো ওকে সরাসরি কিছু বলেনি কারণ ছেলেটার প্রতি কোথাও একটু সহানুভুতি আছে লিয়ানার। ঠিক করেছে এবার সরাসরি 'না' বলে দিতে হবে। এই ঝামেলা আর ভাল লাগছে না।

বাসার ফিরতে একটু রাত হয়ে গেল। মনটা খুশি খুশি লাগছে। কাল ইউনিতে যাবে না সে। অনিকের সাথে আউটিংয়ের প্ল্যান আছে একটা। এখন ফেসবুকে বসতে হবে। পিঙ্কি, শায়লার

সাথে রোজই চ্যাট হয় তার। সবথেকে কাছের বান্ধবীদের সাথে প্রতিদিনের ঘটনা শেয়ার না করলে ঘুম আসবে না। ওরাও লিয়ানার সাথে সব ব্যক্তিগত ব্যাপার শেয়ার করে।

ল্যাপিতে ফেসবুকে লগইন হয়ে ভার্চুয়াল আড্ডায় ডুবে গেল সে। সায়ন, আনিকা, বর্ষা..... বন্ধুদের মাঝে হারিয়ে গেল।

"মামনি, খেতে এসো.." দরজায় মা ডাকতে খেয়াল হল লিয়ানার। রাত এগারোটা বেজে গেছে কখন খেয়াল হয়নি। সব বন্ধুকে রাতের মতো বাই বলে ল্যাপি বন্ধ করল সে। অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। নিজেকে অনেক সুন্দর মনে হয় লিয়ানার। হাত মুখ ধুয়ে আবার আয়নায় তাকাতেই চমকে ওঠে সে। বাথরুমের দরজা খোলা থাকায় ঘরের ভিতরের বেশ কিছুটা দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে একা ছেলে বসে আছে তার বিছানায়!! কিন্তু তার ঘরে তো এভাবে কেউ আসে না! রাগে মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করে উঠল লিয়ানার। ঘুরে বাথরুম থেকে ঘরের ভিতরে পা রেখেই আরেক দফা অবাক হলো সে। কেউ নেই!! খাটে সবকিছু যেভাবে রেখেছিল সেভাবেই আছে। দরজার দিকে চোখ গেল লিয়ানার, দরজা বন্ধ আছে। তো ছেলেটা কোথায় গেল? একটা সেকেন্ড লেগেছে লিয়ানার ঘুরতে, এর ভিতরে তো উধাও হওয়া সম্ভব নয়! দরজা খুলে করিডর দিয়ে ডাইনিংয়ের দিকে গেল সে। পাশে ভাইয়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, সায়েম নেই। ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। ডাইনিংয়ে আব্বু আর আম্মু বসে আছে খাবার নিয়ে। খুব অস্বস্তির সাথে আম্মুকে জিজ্ঞাসা করল সে, "আম্মু বাইরের কেউ কি এসেছে বাসায়?"

অত্যন্ত অবাক হলেন পারভীন আক্তার। বিস্মিত মুখে বললেন, "না তো, কারও আসার কথা ছিল নাকি?"

ভেতরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও আর কিছু বললো না লিয়ানা। হয়ত চোখের ভুল দেখেছে। এখন বলে শুধু শুধু বেকুব হতে চায় না সে। চুপচাপ খেয়ে গেল সে। মা দু'বার বান্ধবীদের কথা জিজ্ঞেস

করলেন, বাবা ইউনির ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন। কোনোটারই ঠিকঠাক উত্তর দিল না সে। আসলে দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। খাওয়া শেষ হতেই রুমে চলে গেল সে।

সাধারণত এখন সে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আজ ঘুম আসছে না। ঠিক ভয় নয়, একটা অজানা শিরশিরানি কাজ করছে মনের ভিতরে। হ্যালুসিনেশনের কথা শুনেছে বা বইতে পড়েছে সে, কিন্তু সে এর আগে কখনো এর মুখোমুখি হয়নি। মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় বলা হয় কারো কথা বেশি চিন্তা করলে অবচেতনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, হ্যালুসিনেশন অসম্ভব নয়। কিন্তু সে তো কারও কথা সেভাবে চিন্তা করছিল না, বান্ধবীদের ছাড়া। তাহলে?

অন্যদিন ঘর একেবারে অন্ধকার নাহলে ঘুম আসেনা তার, আজ হালকা গোলাপি লাইটটা জ্বেলে রাখল। চোখ বন্ধ করতেই অন্যরকম অস্বস্তি শুরু হলো তার। মনে হল অজানা কেউ বিছানার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চোখ মেললেই দেখতে পাবে কেউ তাকিয়ে আছে তার দিকে। কয়েকবার চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু চোখ বন্ধ রাখলেই এই অনুভূতি হচ্ছে। চোখ খুলে রাখলেই স্বস্তি। বিছানায় উঠে বসল সে। ফোন করল অনিককে। মেজাজটা বিগড়ে গেল ফোন বিজি দেখে। এবার ফোন করল রিহানকে। ছেলেটা ওর জন্য অনেক ভাবে, যদিও ছেলেটাকে সে না করে দেবে ঠিক করে ফেলেছে। একবার রিং হল, দুবার রিং হল, রিহান ধরল না। তৃতীয়বার সে ফোন দিত না, যদি না তার ভিতরে অপরাধবোধ কাজ করত। রিহানের সাথে সে ভাল ব্যবহার করছে না। সৎও থাকতে পারেনি। আরেকবার রিং হতেই পরিস্কার গলায় রিহান বলল, “মন খারাপ পাখি? নাকি ভয় করছে?”... হঠাৎ করেই সব ভয় আর অস্বস্তি পালিয়ে গেল, মন খুলে গল্পে বসে গেল সে রিহানের সাথে।

৩
রিহান

চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে ছিল রিহান। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিল এই বুঝি লিটন এসে আলো জ্বালিয়ে তার স্বস্তিটুকু কেড়ে নেবে। এই আশঙ্কার মাঝেই সে স্বপ্ন তৈরী করতে শুরু করল। হ্যাঁ, তার নিজের একটা জগত আছে। সবাই যখন তার থেকে দুরে সরে যায়, অনুভূতির মূল্য যখন কেউ দেয় না, তখন সে ঘুমের মাঝে এই জগতে ঢুকে পড়ে। ঘুমের মাঝে সে চলে গেল নীল সাগরের মাঝখানে এক ছোট সবুজ দ্বীপে। তীরের একটু দুরে সবুজ বনের শুরু। সে একাকী হাঁটুপানিতে বালির ওপর বসে রয়েছে। উপরে সূর্যের তাপ তেমন তীব্র নয়। একের পর এক নীল ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার পায়ের উপর। একটু দুরেই একটা ডলফিন দেখা গেল। হঠাৎ করেই পিছনে রিনরিন শব্দ। চমকে ফিরে তাকাল রিহান। একটা বছর বিশের মেয়ে দাঁড়িয়ে তার পিছনে, পরনে নীল সালোয়ার আর জরি বসানো কামিজ। মুখটা কি অনেকটা লিয়ানার মতো? উঁহু, না। একটু লম্বা ধরনের মুখ। এই নির্জন দ্বীপে কোত্থেকে আসল মেয়েটি? অবাক হল রিহান।

“তুমি পথ হারিয়েছ?” – আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটি। মাথা নাড়ল রিহান, মুখে কথা বলার থেকে মাথা নেড়ে উত্তর দেওয়া তার ভালো লাগে। “আমি তো এখানে প্রায়ই আসি”- জবাব দিল রিহান।

“হুমম, এখানে কিন্তু হাঙর আছে, তুমি উপরে উঠে এসো।”- মেয়েটি পিছন ফিরল। হাঙর আছে সে রিহানও জানে, কিন্তু সে ভয় পায় না। মেয়েটির প্রতি কৌতুহল হচ্ছে তার। পানি থেকে উঠে পড়ল। চলল মেয়েটির পিছন পিছন।

ঠিক এই সময় ফোনের বিরক্তিকর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। লিয়ানা ফোন করেছে। অবাক হল সে। এইসময়ে কখনও ফোন করে না তো! ফোনটা রিসিভ করবে কিনা একমূহুর্ত ভাবল, তারপর

রাগ চলে গিয়ে অপরিসীম মমতা দখল করে নিল মন। "মন খারাপ পাখি? নাকি ভয় করছে?" গল্পে মেতে উঠল সে লিয়ানার সাথে।

৪
বিচ্ছেদ

আজ কেএফসিতে আসতে বলেছে রিহানকে লিয়ানা। আর দ্বৈত ভূমিকা টানতে পারছে না সে। রিহানকে না বলে দেবে আজই।

চারটে বেজে দশ মিনিট হয়ে গেল। কেএফসির বাইরে অধৈর্য্য হয়ে যাচ্ছে সে। এই ছেলেটার কোনদিন সময়বোধ হবে না। বাড়ি ফিরে যাবে কিনা চিন্তা করছে এই সময় হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়াল রিহান। মুখে বোকার মতো হাসি, হাতের দিকে নজর পড়তেই মেজাজটা বিগড়ে গেল লিয়ানার। বোকাটা কিছু রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে এসেছে। মাঝে আবার কয়েকটা গোলাপের উঁকিঝুঁকি। অনিক এটা আনলে ভাল লাগত, কিন্তু এখন প্রচুর বিরক্তি লাগছে। মুখ কঠিন করে তাকিয়ে রইল সে রিহানের দিকে।

"গোলাপগুলো খুব কষ্ট করে খুঁজে আনলাম"- অপরাধীর মতো মুখে বলল রিহান। পাত্তা দিল না লিয়ানা। গম্ভীর মুখে ঢুকে গেল কেএফসিতে। পিছুপিছু ঢুকল রিহান। কাউন্টারে গিয়ে জিঞ্জার চিকেন আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়ে কোনার দিকের একটা খালি টেবিলে বসল দুজন। ফুলের গুচ্ছটা এগিয়ে দিল রিহান। "তোমার জন্য"- বোকা বোকা চোখে হাসল সে। বিরক্তি ফুটে উঠল লিয়ানার মুখে। "এসব নিয়ে যাবে কে! যাইহোক, তোমার সাথে এটাই আমার শেষ দেখা, রিহান"- কাটাকাটা ভাবে কথাগুলো বলল লিয়ানা। হতবিহ্বল অবস্থা রিহানের। সে এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত নয়। বড় বড় চোখে শুধু তাকিয়ে থাকল লিয়ানার দিকে। লিয়ানা মন দিল খাবারে। রিহানের মাথা কাজ করছে না। এত ভালো চিকেনটাও তেতো লাগছে। দু'একটা চিবিয়ে আর খেতে ইচ্ছা করল না। কোকের গ্লাসটা টেনে নিয়ে ঠান্ডা অথচ জ্বালাময় তরল পান করতে লাগল। এর মাঝে বকবক

করে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে গেল লিয়ানা কেন এই সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো কথাই বের হল না রিহানের মুখ দিয়ে। একসময় খাওয়া শেষ হয়ে গেল লিয়ানার। উঠে পড়ল সে। উঠে পড়ল রিহানও। বাইরে এসে লিয়ানা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। প্রবল প্রতিবাদ আশা করেছিল সে রিহানের কাছ থেকে। কিন্তু কিছুই বলল না ছেলেটা। আসলেই বেশ অদ্ভুত সে। যাক, তার নিজের কথা বলে দিয়েছে। এবার রিহান বুঝুক। 'বাইই' বলে একটা সিএনজি নিয়ে চলে গেল। রিহান হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার গমনপথের দিকে। মনে হল এইমাত্র সূর্যটা ডুবে গেল। অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকে। "এখন আমাকে বাসায় যেতে হবে"- মনে মনে বলল রিহান।

৫
লিয়ানা

পাঁচমাস কেটে গেছে। অনিকের সাথে এখন সময়টা খুব ভাল যাচ্ছে লিয়ানার। রিহানকে ভুলেই গেছে সে। প্রতিদিন অনিককে নিয়ে ব্যস্ত সময় কেটে যাচ্ছে। আজ যেমন রাতে আড্ডা হচ্ছে হরর্ মুভি নিয়ে।

ফেসবুকে আড্ডায় রয়েছে অনিক, শায়লা, পিঙ্কি, অদিতি..... সবাই নিজের নিজের ভৌতিক অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে, সেই সাথে সেরা হরর্ মুভির গল্প করছে। অন্যরকম একটা আনন্দের মাঝে সময়টা কেটে গেল। খেয়েদেয়ে বেড়ে যেতে বারোটা বাজল। কাল সাতটায় ক্লাস আছে। দেরি না করে ঘুমানোর চেষ্টা করল লিয়ানা।

ঘুমটা ভাঙল ঠিক কখন সে বলতে পারবে না। হঠাৎ করেই চোখ মেলল সে এবং মনে হল সে কোথায় আছে ঠিক বুঝতে পারছে না। কানে আসল সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন... আর তার ঠিক সামনে একটা ছেলে বসে আছে যেন। অন্ধকার ঘরেও সে বুঝতে পারছে তার খাটের একটু দুরে

একটা ছেলে পিছন ফিরে বসে আছে। বসার ভঙ্গিটিও তার পরিচিত, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না। হঠাৎ করেই প্রচন্ড আতঙ্কে শক্ত হয়ে গেল সে। এই বন্ধ ঘরে কারও আসার কথা নয়। এই গভীর রাতে কে এসে বসে রয়েছে? মনে পড়ে যাচ্ছে একটু আগে বন্ধুদের সাথে করা হরর্ সিনেমার গল্পগুলো। কি বীভৎস হয় ওগুলো!! হয়ত ছেলেটা মুখ ফিরালে দেখতে পাবে একটা চোখ নেই, দাঁত বেরিয়ে যাওয়া এক বিকৃত চেহারা!! মাগোওওও!! অজান্তে চিৎকার করে উঠল লিয়ানা। চোখ বন্ধ হয়ে এলো। হঠাৎ করেই সাগরের গর্জন চলে গেল। বাইরে থেকে ভেসে এলো মায়ের কণ্ঠ, "এই মামনি, দরজা খোল.. কি হয়েছে তোর?" ধড়মড় করে উঠে বসে লাইট জ্বালিয়ে দিল সে। দরজা খুলে দেখল মা উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। "কি হবে, কিছুই হয়নি। যাও ঘুমাও তুমি।"-মা কে বিশেষ পাত্তা দেয় না লিয়ানা। বিরক্ত মুখে চলে গেলেন পারভীন আক্তার।

অস্থির লাগছে লিয়ানার। এই প্রথমবারের মতো মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটছে যা সে বুঝতে পারছে না। ওয়াশরুমের আয়নার সামনে গিয়েই বুকটা কেঁপে উঠল। আয়নায় ঘরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। ঠিক তার খাটের পাশেই পিছু ফিরে বসে আছে সেই ছেলেটা। এত আলোতেও চিনতে পারছে না সে। কিন্তু বসার ভঙ্গিটা খুবই পরিচিত। বুকে হৃদ্স্পন্দন এত জোরে হচ্ছে যে সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে ধুক্ধুক্ শব্দ। সে কি হার্ট অ্যাটাকে মারা যাবে? নিঃস্তব্ধতা যেন চেপে ধরেছে চারিদিক থেকে। কল্পনায় থাকা সব ভৌতিক চরিত্র উঠে আসছে মনের গভীর থেকে। ছেলেটা যদি মুখ ফেরায়....

"আহ্হ্হ্"- অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। পায়ে পায়ে অদৃশ্য আকর্ষণে বেরিয়ে এল ওয়াশরুম থেকে ঘরের ভিতরে। ঠিক সেইসময় হুট করেই চলে গেল কারেন্ট। অন্ধকারে ভরে গেল ঘর। এক সেকেন্ড পরেই অটোমেটিক জেনারেটর চালু হয়ে গেল বাইরে। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করল লিয়ানা ঘরে কেউ নেই, যেন কেউ কখনো ছিল না, চারিদিকের নৈঃশব্দতাও কেটে গেছে, একা দাঁড়িয়ে আছে সে ঘরের মাঝখানে।

৬
রিহান

পাঁচমাস হল লিয়ানার সাথে সম্পর্ক কেটে গেছে রিহানের। প্রচন্ড শারীরিক ও মানসিক শকের ভিতর দিয়ে কাটিয়েছে সে এই সময়টা। এখনো পুরোপুরি আগের অবস্থা ফিরে পায়নি সে। দিনের বেলা চাকরিতে সময় কেটে যায়, রাতে দিনের ক্লান্তিতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। এই ভাবে ব্যস্ততার মাঝে বর্তমানে একটু স্বস্তিবোধ করছে সে। গত পাঁচমাস সে আর স্বপ্ন দেখেনি, নিজের গোপন জগতে ঢোকার চেষ্টাই করেনি। প্রথমে কষ্ট হলেও আস্তে আস্তে সব সংযোগ ত্যাগ করেছে সে, ভুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে লিয়ানাকে।

গতকাল রাত্রে ফেসবুক খুলে মনটা খারাপ হয়ে গেছিল তার। এই পাঁচমাস সে ফেসবুকে বলতে গেলে যেতই না। এত স্মৃতি ছড়িয়ে চারিদিকে, প্রচন্ড মন খারাপ হয়ে যেত। গতকাল এক বন্ধুর মেসেজ পড়তে গিয়ে চোখ পড়ল লিয়ানার ছবিতে। মুহূর্তে উঁকি দিল পুরনো সব স্মৃতি। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। অনেকক্ষণ পর যখন ঘুমাতে গেল, মাথার দুপাশে দপ্‌দপ্‌ করছে ব্যথায়। ভাগ্য ভালো আজ লিটন বাসায় নেই। অন্ধকার ঘরে চোখ বন্ধ করল সে।

কিছুক্ষণ পরেই হাজির হল সেই পরিচিত নীল সাগর, সেই সুন্দর সবুজ দ্বীপ। সে চাইছে, কিন্তু নিজে থেকে কিছুতেই দ্বীপের ভেতরে যেতে পারছে না। কিছু পরেই ভেসে এলো রিনরিন শব্দ, হাজির হলো সেই নাম না জানা মেয়েটি। আজ মুখটা তার হাসিহাসি।

“কি ব্যাপার, মন খারাপ হয়েছে?”- হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল সে।

এই প্রথম রিহানের মনে হল, মনের গোপন কষ্টগুলো এখনই বলে দেওয়া দরকার। আর নিজে নিজে বইতে পারছে না সে। হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটির দিকে।

নরম হাতে রিহানের হাত ধরল মেয়েটি। মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে এলো রিহানের নাকে। উঠে বসল সে বালিয়াড়ি থেকে। এগিয়ে চলল মেয়েটির পাশে পাশে।

“তোমার কষ্টের কথা আমি জানি। লিয়ানা অত্যন্ত বাজে ব্যবহার করেছে তোমার সাথে। এসো আমরা ওকে কঠিন শাস্তি দিই।”

মনের ভিতরে কঠিন দোটানা অনুভব করল রিহান। সে তো কখনো লিয়ানাকে শাস্তি দিতে চায়নি। লিয়ানা কষ্ট পাক এটাও সে চায়না। এই কারনেই তো সে লিয়ানাকে কিছুই বলেনি লিয়ানা তাকে না বলে দেওয়ার পরও। তবু সে এখন নিশ্চুপ রইল।

মেয়েটি আবার বলল, “রিহান, লিয়ানাকে কঠিন মূল্য দিতে হবে। তুমি শুধু একটা কাজ করবে, কোনভাবেই তার সাথে যোগাযোগ করবে না। বাকিটা আমি দেখব।”

ঠিক এই সময়েই ঘরের লাইটটা জ্বলে উঠল। রিহান স্বপ্নের শেষ অংশটা তখনও দেখতে পাচ্ছে যেন, কিন্তু লিটনের কথায় ঘুম পুরোপুরি ভেঙে গেল।

“রিহান ভাই, এত সকাল সকাল ঘুমান কেন?” বিরক্ত মুখে লিটনের প্রশ্নটা শুনলো। কিছু না বলে একটু হেসে চোখ বন্ধ করল আবার সে।

৭
লিয়ানা

গত এক সপ্তাহে লিয়ানার চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। চোখের নীচে কালির গাঢ়তা সাক্ষ্য দিচ্ছে নির্ঘুম রাত্রিযাপনের। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। খাওয়া দাওয়ায় কোনো রুচি পাচ্ছেনা সে কয়েকদিন ধরে। চোখে সর্বদাই আতঙ্ক খেলা করছে। রাত মানেই তার কাছে এখন বিভীষিকা।

সেই ছেলেটাকে এখন নিয়মিতই দেখতে শুরু করেছে সে। পড়ার ফাঁকে যখনই বই থেকে মুখ তুলেছে, অথবা ল্যাপি থেকে মুখ ঘুরিয়েছে, অজানা ছেলেটির ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। জ্বলজ্যান্ত একটা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার একান্ত ব্যক্তিগত ঘরে। অনিকের সাথে বলেছে সে ব্যপারটা। অনিক উড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসই করেনি তার অদ্ভুত কথাবার্তা। বরং তাকে প্রস্তাব দিয়েছে রুমডেটের। তার বন্ধুর ফ্ল্যাট নাকি পুরো খালি পাওয়া যাবে। নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক হলে এসব হ্যালুসিনেশন কেটে যাবে বলে মত দিয়েছে সে। এর সপক্ষে কোন বিজ্ঞানীদের গবেষণাও সে দেখিয়েছে। কিছুই মাথায় ঢোকেনি লিয়ানার। শেষমেষ পাগল হওয়া থেকে বাঁচতে সে মেনে নিয়েছে অনিকের প্রস্তাব। তিনদিন পর ওরা দুপুরে যাবে সেই ফ্ল্যাটটায়। মুক্তি চায় লিয়ানা এই বিভীষিকা থেকে, যেভাবে হোক!

৮
অনিক

মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী বাবার সন্তান অনিকের বরাবরই মেয়েদের প্রতি একটু বিদ্বেষ আছে, যদিও সেটা কেউ জানে না। তার মা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের পাশের ফ্ল্যাটের এক চাকুরীজীবি ছেলের সাথে, অনিকের তখন বয়স আট। তারপর থেকে সে প্রচন্ড ঘৃণা করে এসেছে মেয়েদের। কিন্তু বুঝতে দেয়নি কাউকে। অনেক দিন কষ্ট করে অবশেষে লিয়ানার মতো কাউকে পাওয়া গেল। দাউদাউ করে জ্বলা আগুন এবার কিছুটা নিভানো যাবে। সিয়াম ভাই এর ফ্ল্যাট সে আগেই নিয়ে রাখছে। হিডেন ক্যামও রেডি রাখছে। বার দুই ট্রায়াল দিয়ে দেখেছে, হাই কোয়ালিটি ভিডিও আসবে।

আর মাত্র দুইদিন। এরপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আজ লিয়ানার সাথে তার বসুন্ধরা সিটিতে মুভি দেখার কথা, ব্রেকিং ডন টু। বেশ কিছু টাকা খসবে, মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হয় অনিক। কিন্তু লাভের অঙ্কটা চোখে ভাসতেই মনটা খুশি খুশি হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, বিনিয়োগ সে অনেক করেছে এই ক'মাসে। লীনা তার যোগ্য বান্ধবী। লীনার পরামর্শ মতো ক্যাফে ম্যাঙ্গোতে নিয়ে গেছে লিয়ানাকে, সিসার (বিভিন্ন ফ্লেভারড তামাকের মশলা) সাথে গোপনে মিশিয়েছে অ্যাম্পিটামিন, যার প্রভাবে লিয়ানা আবোল তাবোল দেখতে শুরু করেছে। এর আগে খুব কৌশলে সে লিয়ানাকে গভীর রাতে ভূতের গল্প শুনিয়েছে তার নিজের অভিজ্ঞতা বলে, যেখানে একইরকম একটি মেয়েকে দেখতো সে। লীনার পরামর্শমতো চলে কাজ হয়েছে শতভাগ, লিয়ানা এখন তার সাথে রুমডেটে যেতে রাজি হয়েছে।

একটা মেয়ে কদিন ধরে খুব জ্বালাচ্ছে অনিককে ফেসবুকে। নর্থ সাউথে পড়ে, দেখতে শুনতে মন্দ না, বড়লোকের উঠতি বয়সের মেয়ে। এখনও পিং করছে ফেসবুকে। একটু রিফ্রেশমেন্ট হয়ে যাক, ভাবল অনিক।

"অনিক ভাই, কিছু অসাধারন মুভির লিংক দেন না"

"আররে, আমি কি লিংকের ভান্ডার নাকি? টরেন্ট এ সার্চ করে খুঁজে নাও।"

"ওহহ, ইটস এমেইজিং থিংকিং। ইউ নো, আমার টরেন্ট ক্লায়েন্টে কত স্পিড ওঠে?"

"আমার তো বাংলালায়ন পাঁচশ বারো এমবিপিএস। আমার কুড়ি-ত্রিশের বেশী ওঠে না।"

"হাউ স্ট্রেঞ্জ!! আমারও তো সেইম প্যাকেজ, আমার ওঠে দেড়শ!!"

অনিক অবাক হয়। এত স্পিড তো সে কখনই পায় না।

"কি ক্লায়েন্ট ইউজ করো তুমি?"

"ওহ অনিক ভাই, নরম্যাল ক্লায়েন্টে আপনি বেশি স্পিড পাবেন না। আমার কাছে একটা মডিফায়েড ক্লায়েন্ট আছে। সেটাতে এই স্পিড পাই।"

“আমাকে পাঠিয়ে দাও তো, এখনি” – অনিক বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে যায়। কত মুভি নামানোর ইচ্ছা আছে, কিন্তু এই হতচ্ছাড়া স্পিডের কারনে কিছুই করতে পারে না সে। নীলা আপলোড করে দেয় ক্লায়েন্টটা।

“অনিক ভাই, ট্রাই ইট। দেন গিভ মি আ ট্রিট, ওকেই?”

“শিওর। কাজ করলে পিজা হাট, প্রমিস”-অনিক ডাউনলোড করতে থাকে ক্লায়েন্ট সফটওয়্যারটা।

৯
রিহান

রিহান এখন বসে আছে রেললাইনের ওপরে। তেজগাঁও স্টেশনের কিছু দুরে সার সার মালবাহী ওয়াগন পড়ে রয়েছে। চারটা লাইনের দুটো মোটামুটি রেগুলার ট্রেন যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত হয়, বাকি একটা দিয়ে কখনো সখনো মালবাহী বগিগুলো যাতায়াত করে। বড়বড় ঘাস হয়ে গেছে রেললাইনের পাশে। সন্ধ্যার সময় আশেপাশে গাঁজার আসর বসায় লোকজন। তবু এই জায়গাটা ভাল লাগে তার। যানজটের এই ঘিঞ্জি শহরে একটু ফাঁকা জায়গা যেন দেয় বুকভরে শ্বাস নেওয়ার অবকাশ। রেললাইনের সমান্তরাল চলে যাওয়া দেখে অদ্ভুত ভাব আসে মনে, দুটো জিনিস, কত মিল কিন্তু কখনো মিলবে না!

নীলার সাথে তার পরিচয় একটা ওয়েবসাইটে। যদিও কখনোই তেমন কিছু কথা হতো না, কিন্তু পাঁচ মাস আগে যখন লিয়ানার সাথে বিচ্ছেদে মানসিকভাবে রিহান বিধ্বস্ত, তখন নীলা একরকম জোর করেই সব খুঁটিনাটি শোনে রিহানের থেকে। তারপর প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য হলেও সে সময় দেয় রিহানকে, প্রতিদিনের গল্পে কেটে যায় কিছুটা সময়। রেললাইনে বসে ফেসবুকে ঢুকল সে। ঢুকেই দেখল নীলা অনলাইন।

“হুই নীলা, কি করো?”

“রিহান, তোমার জন্য খুব জরুরী একটা খবর বের করেছি। ইমেইলটা চেক করো প্লিজ। অনিকের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি।”

ফেসবুক থেকে বেরিয়ে ইমেলে ঢুকল রিহান। দুটো মেল ফরোয়ার্ড হয়ে এসেছে। খুলল সে। একি!! ভিতরে এ কি লেখা!! কোনো এক অনিক পাঠিয়েছে লীনা নামের কারো কাছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু লিয়ানা নামের যে মেয়েটি, তাকে রিহান ভাল চেনে বললে ভুল হবে, কখনো ভুলতে পারে না। সে খুব দ্রুত মেইল দুটি ফরোয়ার্ড করল লিয়ানার ইনবক্সে, গত পাঁচ মাসের ভিতরে এই প্রথম। তারপর মোবাইলের ম্যাসেজে গিয়ে লিখল,

“Plz Chk Ur Mail. Itz Urgent & Very Important 4 U.”

সেন্ড বাটনে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ইথারে ভেসে লিয়ানার নাম্বারে ছুটল মেসেজ, পাঁচমাসে প্রথমবার।

১০
লিয়ানা

শরীর আজকাল একদম ভাল লাগে না। সারাক্ষণ ঘুমাতে ইচ্ছা করে দিনে। রাত হলেই সেই হ্যালুসিনেশন চলতে থাকবে। বিকালে অনিকের সাথে বসুন্ধরায় যাওয়ার কথা। দুপুরে তাই একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল লিয়ানা।

মোবাইলের ম্যাসেজ টোনে সাধারনত কারো ঘুম ভাঙ্গে না, কিন্তু লিয়ানার টোনটা এতটা কড়া যে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুমচোখে স্ক্রিনটা সামনে নিয়ে দেখল মেসেজ পাঠিয়েছে রিহান! অবাক হল সে। গত পাঁচমাসে ছেলেটা কোন যোগাযোগ করেনি। কিছুটা বোঝে সে ছেলেটাকে। অনেক অভিমানী। কিন্তু নিজে থেকে কি এমন জরুরী জিনিস পাঠালো মেইলে!! মোবাইল থেকেই মেলে ঢুকল সে।

দুটো মেল। অনিক এবং লীনা নামের মেয়েটার মধ্যে চালাচালি হয়েছে। ঘা ঘিনঘিন করে উঠল লিয়ানার। আস্তে আস্তে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল সব কিছু। অনিক! অনিক কে এত বিশ্বাস করত সে! সেই অনিকের এই চেহারা!! ড্রাগসের সাহায্যে লিয়ানাকে হ্যালুসিনেশন দেখানোর ব্যবস্থা করেছে সে! তারপর পরশুর ফ্ল্যাটে রুমডেটেও চুড়ান্ত নোংরামির ব্যবস্থা করে ফেলেছে!! ও গড!! বালিশে মুখ চেপে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল লিয়ানার ছোট্ট দেহটা। অনেকক্ষণ পর কিছুটা হালকা হয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিল সে। প্রথমেই অনিক নামের শয়তানটাকে দুর করতে হবে। তারপর, তারপর..... না, পরে ভাবা যাবে।

অনিকের ফোন এলো ঠিক সময়মতই। রিসিভ না করে রেখে দিল সে। একটা টেক্সট লিখল,

“Never Call Me Again Or I’ll Call d Police. I’ve got all of ur plan wid the slut Lena. Get off 4rm Ma lyf 4Ever.GoodBye.”

এরপর ফোনটা বন্ধ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সে, গভীর ঘুম।

১১
রিহান

রিহান বসে আছে সেই একাকী নির্জন দ্বীপের সৈকতে পানিতে পা ডুবিয়ে। নীল জলরাশি আছড়ে পড়ছে পায়ের উপরে। পাখি ডাকছে পিছনের বনে। সেইসময় সে এল। রিনিঝিনি শব্দ তুলে চলে এল।

“রিহান, কঠিন সাজা পেয়েছে লিয়ানা। তুমি খুশি হয়েছ?” হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে নীল কাপড় পরা মেয়েটি।

“না”- সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় রিহান। “লিয়ানা খুব কষ্ট পেয়েছে,আমি এটা চাইনি।”

“কিন্তু লিয়ানার ভালই হয়েছে এতে, বন্ধু চেনা খুবই কঠিন রিহান। সে অনেক বেশি মূল্য দিতে যাচ্ছিল। তুমি তাকে না বাঁচালে কি হত, রিহান?”

অন্যমনস্ক হয়ে গেল রিহান।

ঘুম ভাঙল মোবাইলের চড়া গানের আওয়াজে। লিটন গান চালিয়েছে মোবাইলে।

এলোমেলো যত লুকোচুরি, চল শেষ করি আয়... ঈশারায় বলাবলি, বদলে যাক আজ কথায়... মুড়ে দেব তোকে আদরে, ভালবাসায়.. উড়ে যাবে পাখি আকাশ কোনে তায়...

মোবাইলের স্ক্রিনটা জ্বলজ্বল করছে। লিয়ানার মেসেজ আছে। খুব আস্তে আস্তে মেসেজটা খুলল সে।

“Sorry 4 all these & grateful 4 still loving meh.. Wanna see u in KFC tomorrow, I LOVE U”

অসীম শান্তিতে মুখটা প্রশান্তিতে ভরে গেল রিহানের। চোখটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের ভিতরে সে পৌঁছে গেল তার নিজের পৃথিবীতে।

বসে আছে সে অস্তাচলগামী সূর্যের আলোয় দ্বীপের তীরে। পাখিগুলোর ডাক আজ যেন অনেক মিষ্টি মনে হচ্ছে। একটা বড় ঢেউ আসছে। এসময়েই পিছনে শুনতে পেল রিনরিন শব্দ। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল এবং একই সাথে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রিহানের। আসছে। সামনে নীল ঢেউ, পিছনে লিয়ানা। মুখে মিটি মিটি হাসি নিয়ে ঝড়ের মতো আসছে সে। ঝড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রিহান। ঝড় আসছে, সুখের ঝড়.....

এক টুকরো আকাশ

রাসকিন বন্ড

অনুবাদ:- অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত

“নীলুউউউউ..... নীলুউউউউ”—বীণা ডেকে চলল। পাথরের ওপর দিয়ে হাঁচড়েপাচড়ে, নতুন কচি ঘাসগুলো মাড়িয়ে এগিয়ে চলে সে আর ডেকেই চলে “নীলুউউউ..... নীলুউউউ”

নীলু--- তাদের নীলা গাইটার নাম। আরেকটা গরুও আছে তাদের, গোরী। দুটোই হাড় পাজি... খালি চরতে চরতে দূরে দূরে চলে যায়। কখনো নদীর ধার বেয়ে পাইনবনের ভেতরে, কখনো বা আরও ওপরে উঠে যায় চরতে চরতে। কোনদিন তারা নিজেরাই ফিরে আসে... আর কোনদিন বীণাকেই খুঁজতে যেতে হয় তাদের।

গরু দুটো ঠিক সময়ে বাড়িতে না ফিরলেই মা ওকে পাঠাবে খুঁজে আনতে। বীণার দাদা বীজুও যায় তার সাথে, তবে শিগগিরি আবার তার পরীক্ষা শুরু হবে বলে একা বীণাকেই বের হতে হল।

বীণার যদিও একা বেরোতেই ভালো লাগে, ইচ্ছে করেই সে কখনো কখনো গরুগুলোকে দূরের উপত্যকায় নিয়ে যায়। গরুগুলোও আবার বীণাকেই বেশি পছন্দ করে, বীজু থাকলে তারা মনের আনন্দে চরতে পারে না.... বেগড়বাই দেখলেই বীজু ল্যাজ ধরে মুচড়ে পাকড়ে আনে তাদের। বীণা সেরকমটি নয়।

হিমালয়ের এই জায়গাটি গাড়োয়াল বলেই লোকে চেনে। ঘন পাহাড়ী বন আর উঁচু উঁচু একাকী সব পাহাড়। বীণার কাছে এরাই কাছের লোক এরাই আপন। বরং বাজারে গেলেই বীণার ভয় করে বেশি ভিড়ের মাঝে খালি মনে হয় এই বুঝি হারিয়ে গেল,ভিড়ে কেমন দমবন্ধ লাগে। গ্রামে বাজার নেই শহরে যেতে হয় মাসে দু’তিন বার। শহর তাদের গ্রাম থেকে পাঁচ মাইলটাক দূরে, টুরিস্ট সিজনে সেখানে উদুম ভিড় হয়।

বীণা দশ বছর হল.. বা নয় কি এগারোও হতে পারে, কে জানে? গ্রামে কেউই তো আর জন্মদিন-টিন পালন করে না, তবে মা বলে সে নাকি সেইবার শীতে জন্মেছিল যেবার বরফ পড়তে পড়তে একবারে জানালা অবধি উঠে এসেছিল। বীণা শুনেছে সেটা নাকি দশবছর আগের কথা... সে হিসেবে দশ বছরই তো হলো বোধহয়। আজ দু'বছর হল তার বাবা মারা গেছেন। যদিও তার জন্য তাদের খুব একটা কষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে না। পাহাড়ের গায়ে তাদের তিনখানা ছোট ছোট চাষের জমি আছে সেখানে তারা আলু, আদা, ভুট্টা বা কখনো পেঁয়াজ ফলায়... বিক্রি করার মত হয় না তবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।

পাহাড়ি মেয়েদের মতই বীণাও ছোটখাট টুকটুকে ফরসা দুই গালে লাল লাল আভা। চুলগুলো মা দুখানা বিনুনি করে দেয়। তার গলায় একটা চিতার নখ আছে, সবসময় গলাতেই থাকে ওটা। ওর দাদার গলাতেও আছে একটা।

বীণার পুরো নামটা হল বীনাদেবী, দাদার বিজয়। কিন্তু সে নাম সবাই ভুলেই গেছে কবে... সবাই বীণা আর বীজুই ডাকে।

এবার বীনা একটু দাঁড়াল কোথায় যেন তার গাইটার গলার ঘন্টির আওয়াজ শোনা গেল না? ঐতো ওদিকে.. পাইন বনের ভেতর দিয়ে পাইনের পিছল পাতা মাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই হাসির খলখল শব্দ শোনা গেল কোথা থেকে... তার সাথে কাপ ডিসের আওয়াজও। পিকনিক পার্টি, টুরিস্টরা এসেছে বনে পিকনিক করতে। একজন ঝকমকে শাড়ি পড়া মহিলা, হালকা ছাপা শার্টে একজন লোক আর দু'তিন জন বাচ্চাকাচ্চা। বীণা পাইনগাছের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপটি করে দেখতে লাগল... কি সুন্দর সুন্দর জামা ওদের, খাবারের সুগন্ধ নাকে এসে নাড়া দিল..কেমন যেন খিদে খিদে পাচ্ছে বীণার। তারপরই বীণার চোখ পড়ল মহিলাটার একপাশে রাখা ছাতাটায়। চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল বীণার.... নীল রঙের ঝলমলে একখানা ছাতা.... কেমন সুন্দর খোলা রয়েছে দেখ, ঠিক মনে হচ্ছে একটা নীলফুল পাপড়ি মেলে ফুটে রয়েছে। আসমানী নীল আকাশের একটা টুকরো যেন সেটা।

না, বীণা যে ছাতা দেখেনি তা নয়... তাদের বাড়িতেই একখানা কালো বড় ছাতা আছে... কিন্তু সেটা আর এখন ব্যবহার করা হয় না, ইঁদুররা গোল গোল গর্ত করে রেখেছে তাতে। কিন্তু এই ছাতাটা কেমন সুন্দর ছোট্ট, ঝকমকে একখানা ফুলের মত ছাতা ! যেন পাহাড়ের কোন পাথরের খাঁজে ফুটে ওঠা জংলি ফুল !

ভালো করে দেখবে বলে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পিকনিকারদের চোখে পড়ে গেল বীণা।
"হ্যালো..... আরে কি মিষ্টি একটা পাহাড়ী মেয়ে দেখ দেখ..."
"গালদুটো কি সুন্দর লাল লাল.... ইসস বেচারীর জামাগুলো কেমন ছেঁড়া-টেঁড়া..."
বীণা শুনতে পেলেও তাতে তার কিছু এসে গেল না।
"হুম এদিককার পাহাড়ের লোকেরা খুবই গরিব" লোকটা গম্ভীর মুখে বলল
"আহারে... অ্যাই এদিকে আয় তো... কিছু খেতে দিই" একজন মহিলা ডাকল বীণাকে
বীণা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল। খুব ইচ্ছা করছিল তার পালাতে। কিন্তু ছাতাটা ভালো করে দেখবার আকর্ষণও কম নয়।
"আরিব্বাস... মেয়েটার গলায় এটা কি দেখ!" কমবয়সী মহিলাটা অবাক চোখে তাকিয়ে
"নেকলেস.... বাঘের নখের!" লোকটাও অবাক
"ওগো আমি নেব একটা" মহিলাটা আবদার করে ওঠে।
"চলো দেখি নিচে দোকানে টোকানে পেয়ে যাবে হয়তো"
"ধূর এসব দোকানে টোকানে পাবে না... এত দোকান ঘুরে জিনিস কিনলাম তো দেখেছ কোথাও..?
"হুম... তাহলে দেখি ... আচ্ছা ওকে তিন চারটাকা দিলে দিয়ে দেবে মনে হয়। গরিব মেয়ে" বলে, পকেট থেকে লোকটা দুটো দু'টাকার নোট বের করে বীণার দিকে এগিয়ে দিল, আঙুল দিয়ে লকেটটা দেখিয়ে। বীণা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে লকেটটা হাত দিয়ে ঢেকে (যদি আবার উত্তেজনায় মহিলাটা কেড়েই নেয় লকেটটা) জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল। লোকটা এবার একটা পাঁচটাকার নোট বার করে এগিয়ে ধরল... কিন্তু বীণা সেই মাথা নেড়েই যেতে থাকে।

“দূর বোকাটা” মহিলাটা ব্যাজার মুখে বলে

“হয়তো ওদের কোন সংস্কার টংস্কার হবে তাই বিক্রি করবে না” লোকটা বলে “তাও দেখি দাঁড়াও চেষ্টা করে” তারপর বীণার দিকে হাসি হাসি মুখ করে লোকটা বলে – “আচ্ছা কত টাকা চাই বলো? কি নেবে? এখান থেকে কিছু নেবে?” বলে হাত দিয়ে পিকনিকের সব জিনিসপত্র খাবারদাবারগুলোর দিকে দেখিয়ে দেয়।

বীণা এবার একমুহূর্ত অপেক্ষা না করেই.. আঙুল দিয়ে ছাতাটাকে দেখিয়ে দিল।
“ওমা... পাজিটার আমার ছাতার দিকে নজর” মহিলাটা ঝামটা মেরে ওঠে
“ওভাবে বোলো না... তুমিও কিন্তু ওর লকেটার দিকে নজর দিয়েছ” ঠাট্টার সুরে লোকটা বলে
“সেটা আলাদা ব্যাপার”
“তাই কি?”
এবার দুজনের মধ্যে জোর তর্ক লেগে গেল। শেষমেষ মহিলাটা হাল ছেড়ে ছাতাটাকে ছোঁ মেরে তুলে বীণার হাতে বাটটা গুজে দিল... “নে হল এবার?”

বীণা গলার থেকে সঙ্গে সঙ্গে লকেটটা খুলে মহিলাটার দিকে বাড়াতেই, মহিলা কেড়ে নেবার মত টান মেরে নিয়ে ভালো করে দেখতে থাকে এবার লকেটটা।

বীণার এইসব দেখার আর সময় নেই ছাতাটাকে মাথার ওপর ধরে রোদদুরে ভালো করে দেখে সেটাকে... নীল আসমানি রঙের ভেতর দিয়ে আলো এসে নীলাভ আলোয় তার মুখটাকে ধুইয়ে দেয় যেন। সেটাকে নিয়ে আবার পাইন বনের ভেতর ঢুকে পড়ে বীণা।

বীণা ছাতাটাকে আদৌ বন্ধ করে না। এমনকি বাড়ির ভেতরেও খোলাই রাখে। ঘরের এককোণে ছাতাটাকে খুলে সাজিয়ে রাখে। বীজু কখনো কখনো সেটায় ধাক্কা খেয়ে রেগেমেগে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু খানিক পরেই আবার বীণা সেটাকে খুলে রাখে। বন্ধ থাকলে ছাতাটাকে মোটেই সুন্দর লাগে না।

আজকাল যখনই বীণা বাইরে যায় ছাতাটাকে নিয়েই বেরোয়। গরু চরাতে, ঝোরা থেকে জল আনতে বা তেহারী রোডের ওপর চায়ের দোকানে দুধ দিয়ে আসতে। পাহাড়ী রাস্তায়, বনের মধ্যে মাঝে মাঝেই নীল ছাতার তলায় বীণাকে দেখা যায়।

বুড়ো রামভরোসার তেহারী রোডের ওপর একটা ছোটমত চায়ের দোকান আছে। নামেই রোড। পাহাড়ের ওপরে যাওয়ার জন্য একমাত্র এবড়ো খেবড়ো একটা রাস্তা। টুরিস্টরা মাঝে মাঝে আরো ওপরে শিখরে ঘুরে আসতে চাইলে এই রাস্তায় গাড়ি করে যায়। আশেপাশের সব গ্রামের লোকেদের জন্য দিনে একটাই বাস আসে যায়। সেই বাস এইখানে থামলে লোকজন ঐ দোকানে চা- দুধ খেতে আসে। আশেপাশে আর কোন দোকান নেই... রামভরোসার চা-দোকানই ভরসা। মাঝখানে কয়েক বোতল কোকা-কোলাও রেখেছিল বুড়ো, কিন্তু বরফের ব্যবস্থা নেই, রোদ্দুরে পড়ে থাকে সেগুলো। টফি-লজেন্সও রাখে সে। বীণা বা বীজুর কপালে কোনদিন দু-একপয়সা জুটলে লজেন্স কেনে এখানে এসে।

সেদিন রামভরোসা বীণাকে দেখে অবাক।
“কি রে বীণা? ঐটা কি রে তোর কাছে?” বুড়ো বলে
ছাতার বাটটা ধরে সেটাকে পাক খাইয়ে হাসে বীণা।
“একিরে এইটা তো মেমদের ছাতা! তুই পেলি কোথা?” বুড়ো বলে
“আমি পেয়েছি... আমার সেই যে বাঘনখের লকেটটার বদলে”
“হ্যাঁ!! সেটা তো দৃষ্টি কাটানোর জন্য ছিল রে ! দিয়ে দিলি? কিন্তু ছাতা নিয়ে তুই করবিটা কি? সূর্যের তো তাপ নেই আমাদের এখানে। আর বৃষ্টি পড়লে ঐ ফিনফিনে ছাতায় আটকাবে? ঐটা শুধু বড়লোকদের লোকদেখানো খেলনা” বুড়ো মোটেই খুশি হয় না।

বীণা মাথা নাড়িয়ে মুচকি হাসে। সত্যিই বলেছে বুড়ো খেলনাই তো... বীণার খেলনা।

“শোন না বীণা একটা বুদ্ধি দিই তোকে” রামভরোসা বলে। “তোর তো জিনিসটা কোন কাজে লাগবে না। আমাকে বেচে দে না? পাঁচটাকা দেবো!”
“উহু পনেরটাকা দাম নাকি এটার জানো?”
“আচ্ছা দশটাকা দেবো তোকে”
“উহু”
“বারো টাকা?” রামভরোসা বলে। কিন্তু আশায় ছাই দিয়ে বীণা কিছু না বলে টেবিলে একটা পাঁচ পয়সা রাখে “দাও দেখি, আমায় লজেন্স দাও দুটো”
রামভরোসা তার ঝোলা গোঁফদুটোয় হাত বোলাতে বোলাতে বীণার জন্য হতাশ মুখে দুখানা লজেন্স বার করে দিয়ে দুঃখু দুঃখু মুখে নীল ছাতাসুদ্ধু বীণাকে চলে যেতে দেখে।

বীণা পাহাড়ের একটু উপরে উঠে পাইনগাছের ছাওয়ায় বসল জিরোতে,ছাতাটাকে খুলেই রেখে তার পাশটিতে। বসে থাকতে থাকতে কখন যে তন্দ্রা এলো টেরই পায়নি বেচারী। হঠাৎ দমকা বাতাস ছুটে পাইনবন মর্মর করে ওঠে, নীচে সরু সরু পাইন পাতা গড়িয়ে যায় বাতাসের দাপটে। তার সাথে বীণার অলক্ষে ছাতাটাও ঘাসের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে ছুটতে থাকে। হঠাৎ ছুটে আসে আরেকটা বাতাসের দমক এবার ছাতাটা শব্দ করে গড়াতে থাকে উল্টো হয়ে সেই আওয়াজেই বীণার ঘুমটাও ভেঙ্গে যায়।

আঁতকে উঠে লাফ মেরে ছাতাটার কাছে আসতেই আবার বাতাসের দমকে সেটা গড়িয়ে চলে আরো নীচে। বাতাসটাও যেন খেলা পেয়ে গেল... ছাতটাকে বীণা ধরব ধরব করে অমনি এক ঝটকা পাঠিয়ে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে চলে সেটাকে নীচের দিকে।

ঢাল এবার আরো বাড়তে শুরু করেছে। বীণাও জানে এখন যদি ছাতাকে ধরতে না পারে তাহলে সেটা গিয়ে খাদের দিকে পড়বে। আরো জোরে দৌড়তে লাগল বীণা... ছাতাটাও ততক্ষণে বাতাসের ধাক্কায় প্রায় কিনারায় গিয়ে পড়েছে, সেখানে খানিক্ষণ ব্যালান্সের খেলা দেখিয়ে তারপরেই পড়ে গেল খাদে।

বীণা কিনারায় গিয়ে হাঁটু গেছে ঝুঁকে নিচে তাকায়। প্রায় একশো ফুট নীচে বড় বড় পাথরের ফাঁকে যেখানে চেরিগাছ গজিয়েছে সেখানে দুটো ডালের ওপর মাথাটা আটকে ঝুলে আছে ছাতাটা।

বীণা একমুহুর্ত চিন্তা না করেই কিনারা বেয়ে নামতে শুরু করে... কাজটা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই .... পা অসাবধানে ফোকরে না পড়লেই গেছে ....আস্তে আস্তে অনেক সাবধানে নামতে থাকে বীণা বড় একটা পাথরের ওপর থামে সে। সেখান থেকে চেরি গাছের একটা মোটা ডাল হাতে আসে সেটা বেয়ে বেয়ে গাছটার দিকে এগোয় বীণা। সেটার নীচে কিছুই নেই.. পুরো ফাঁকা ....। গাছের গুঁড়ির কাছে পৌঁছলে প্রাণপণে হাত বাড়িয়ে দেয় সে যে ডালে ঝুলছে ছাতাটা সেটার নাগাল পেতে। ডালটা হাতে এলো ভালোভাবে চেপে ধরে ঝুলে পড়ে সে... এখান থেকে পড়লে আর খুজেও পাওয়া যাবে না বোধহয়। দুহাত দিয়ে শরীরটা টেনে তোলে ডালটাতে, তারপর উঠে এগিয়ে গিয়ে ছাতাটাকে উদ্ধার করে। এবার আরেকটা দুঃসাহসী কাজ করতে হবে... ডালটার শেষ মাথায় গিয়ে একটা লাফ মারলেই বড় বড় পাথরের মাঝে নামা যাবে।

প্রায় কুড়ি মিনিট পর নীচে ঝোরার পাশ দিয়ে বীণাকে ছাতা হাতে উঠতে দেখা যায়। সারা গায়ে আঁচড়ের দাগ নুনছাল উঠছে।

বীজু যখন স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছে তখন প্রায় বেলা দুটো, আর সেই সকাল ছটায় খেয়েছিল আর পেটে কিছু পড়েনি। তবে কিনা.. কিঙ্গোরা ঝোপে, ব্লুবেরী ঝোপে এখন ফল পাকার মরসুম, তাই সেগুলোর বেগুনী রঙে বীজুর ঠোঁট রাঙানো।

রামভরোসার দোকান থেকে কিছু কিনবার মতো পয়সা নেই তার কাছে। তবুও একটু দাড়িয়ে বয়মগুলোকে একবার দেখল বীজু।

“কি নিবি?” রামভরোসা বলে
“নাঃ আজ পয়সা নেই”
“পরে দিস”

বীজু মাথা নাড়ে। তার কয়েকটা বন্ধু এই রকম বাকিতে নিয়ে যেত আগে লজেন্স-টফি। মাসের শেষে জমতে জমতে এতো বাকি দাঁড়াল যে দিতে না পেরে রামভরোসাকে তাদের প্রিয় জিনিসগুলো দিয়ে দিতে হয়েছে তাদের।--- চকচকে একটা ছুরি, ছোট কুড়ুল বা একবয়ম আচার, বা একজোড়া দুল। রামভরোসা সেগুলো হয় বিক্রি করেছে নয় নিজের কাছে রেখেছে।

আসলে রামভরোসা বীণার ছাতাটা হাতাবার তালে আছে। তাই বাকিতে বীজু বা বীণা কাউকে ভালোমত জিনিস গছাতে পারলে.... তবে দুজনের একজনও বাকিতে লজেন্স নিতে রাজি না।

কিঙ্গোরাবেরী চিবোতে চিবোতে এগিয়ে যেতে বীণাকে দেখতে পেল গরুদুটো নিয়ে ছাতা মাথায় আসছে বীণা। যদিও রোদ নেই তাও ছাতাটা মাথার ওপর খুলেই রেখেছে। বীজু মুঠো ভরে বীণাকে কিঙ্গোরাবেরী দিল.... ছাতাটা দাদার হাতে দিয়ে বীণা সেগুলো মুখে পুরতে লাগল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা.... পাহাড়ে অন্ধকার তাড়াতাড়ি নামে... তাও এই অন্ধকারেও বীজুর মাথার ওপরেও ছাতাটা খোলাই রইল।

গ্রামে এতদিনে প্রায় সবারই বেশ লোভ লোভ লাগতে শুরু করেছে বীণার ছাতাটা দেখে। স্কুলমাস্টারের বৌ গোমড়া হয়ে ভাবেন তিনি বি.এ পাশ অথচ তার কাছে অমন একখানা ছাতা নেই, আছে এক হাকুচ কালো ছাতা। মাস্টারবাবু একবার বলেছিলেন সেটাকে নীল রং করে এনে দেবেন কিনা। তাতে বৌ এমন এক চাহনি উপহার দিল যে মাস্টারবাবুর রক্ত একেবারে হিম হয়ে গেল।

পুরোহিতমশাই মহাউৎসাহে ঘোষনা করে গেলেন এ হপ্তায় নিচে বড়শহরে যাবেন যখন ঠিক ঐরকম একখানা ছাতা এনে তাক লাকিয়ে দেবেন সবাইকে। কিন্তু গোমড়ামুখে তিনদিন পর শহর থেকে ফিরে এসে জানালেন শহরেও নাকি পাওয়া গেল না.... দোকানে জানা গেছে দিল্লি ছাড়া ও জিনিস আর মিলবে না।

লোকেরা এবার নিজেদেরই সান্ত্বনা দিতে লাগল—আরে ও পলকা ছাতায় কি বৃষ্টি আটকাবে? ভারী বৃষ্টি হলেই দেখো; চড়া রোদ উঠলে ঐ ফিনফিনে কাপড়ে আটকাবে না.. সেতো বোঝাই যাচ্ছে।

শিগ্গিরি সেইটা পরীক্ষা করার সময়ও এসে গেল। বর্ষার মরসুম শুরু হয়ে গেছে। বড় বড় কালো মুশকো মেঘ গুড়গুড় করে বেড়াচ্ছে। বীণা পাহাড়ের ধারে বসে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছে.... ঝমঝমিয়ে নামতেই ছাতাটা মাথার ওপর ধরল... বড় বড় ফোঁটা ছাতার কাপড় বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল... বীণা পাতলা কাপড়ের ভেতর দিয়ে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে। তারপর গুড়ুম করে মেঘ আরেকবার গর্জন করে ঝরনার মত বর্ষন করতেই ছাতা মাথায় বীণা দৌড়তে শুরু করল... তার গা একটুও ভেজেনি। শুধু পাদুটো ভিজে যাচ্ছে।

বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে। পাহাড় ঘন সবুজ আলোয়ান পড়ে দাড়িয়ে এখন। পাথরের ফাঁকে আর বড় বড় গাছের গায়ে ঝুলো ঝুলো ফার্ণ গুলো সতেজ হয়ে উঠেছে। সকাল থেকেই ঘন কুয়াশার চাদর পাহাড়কে ঢেকে ফেলে। ভারী চমৎকার মরসুম এটা.... কেবল যদি জোঁকদের উৎপাত না থাকত।

প্রতিদিন বাড়ি ফিরবার সময় বীণার পায়ে দু'তিনটে করে জোঁক এঁটে থাকবেই। রক্ত খেয়ে ডুমোডুমো হয়ে গেলে আপনেই ওগুলো খসে পড়ে। কিন্তু না পড়লে বুঝতেও পারা যায় না যে জোঁক ধরেছিল... খসে পড়বার পর জায়গাটা চুলকোতে থাকে, তার আগে টেরও পাওয়া যায় না। বুড়ো অনেকে আবার মনে করে জোঁক দিয়ে বদরক্ত বার করে নিলে নাকি অনেক রোগ দূর করা যায়। রামভরোসারও বেশি মাথাব্যাথা করলে কপালে দুখানা জোঁক লাগিয়ে শুয়ে পড়ে।

প্রথমে গ্রীষ্মের চড়া রোদ্দুর, এখন ঘনবরষা, রোদে জলে ছাতাটার এদ্দিনে একটু রং জ্বলতে শুরু করেছে। ব্রাইট নীল থেকে ফেডেড নীল রং ধরেছে অ্যাদ্দিনে। কিন্তু তাহলেও এখনো বেশ সুন্দরই আছে সেটা। দেখতে পলকা হলেও বেশ টেঁকসই। রামভরোসা এখনো ওটা পাবার ইচ্ছা, বেচবে না নিজের কাছে রাখবে।

স্কুল এইসময় বন্ধ, কিন্তু বীজু এইসময় বাড়িতে বসে থাকে না। নীলু আর গোরী প্রচুর দুধ দিচ্ছে আজকাল। বাড়ির জন্য খানিকটা রেখে বীজু প্রতিদিন এককিলো রামভরোসার কাছে বিক্রি করে আসে আর হাফকিলো হাফকিলো করে মাস্টারবাবু আর পুরোহিতমশাইয়ের কাছে।

রামভরোসা বীজুকে বলেছিল ছুটিতে দোকানে কাজ করবে কিনা। কিন্তু বীজুর সময় নেই এখন মায়ের সাথে জমিতে বীজ বুনতে হয়। তাই রামভরোসা রাজারাম নামে এক ছোকরাকে রেখেছে ঐ বীজুর স্কুলেই পড়ে বীজুর বন্ধু নয় যদিও। বাসনকোসন ধোওয়া ছোটখাট ফাইফরমাস খাটে।

সেদিন বীণা দোকানের সামনে দিয়ে গেল মাথায় সেই নীলছাতা। রামভরোসা গালে হাত দিয়ে দেখে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করতে থাকে আপন মনে।

“কি হোলো বাবুজি?” ছোকরা শুধোয়
“কিস্যু নাহ্। ঐ ছাতাখানা দেখলেই কেমন বিরক্ত লাগে রে আজকাল, বীণা আর ঐ ভূতের ছাতা যত নষ্টের গোড়া”
“কেন গো বীণা আবার কি করল?”
“ঐ যে ছাতাটা বেচবে না। দশটাকা ! বুঝলি দশটাকা দেবো বললাম তাও নাকি দেবেনা!”
“বারো টাকা বললে হয়তো.....”
“ধূর বারো টাকা দেবো কেন রে? ছাতাটা তো এখন নতুনও নেই.. রং অল্প অল্প জ্বলে গেছে দেখিস না? আট টাকাও দাম হবে কিনা ঠিক নেই !”
“তাইলে আর কিনে কি করবে? ও বেচে তোমার আর লাভ তো কিছু থাকবে না।“
“দূর মুখপোড়া... বেচব কে বলল.. আমি নিজের কাছে রাখব ঐখান... কি সুন্দর জিনিসটা!”
“নিয়ে করবেটা কি? তুমি তো কোনদিন বাইরেও যাও না।“
“তাতে কি এসে গেল রে তোর অ্যাঁ, আমার ওটা চাই.... এমন সুন্দর একখানা ছাতা”
রাজারাম কেতলিতে করে উনুনে জল চাপায়, তারপর ঝাড়ু নিয়ে দোকান ঝাড়তে ঝাড়তে বিড়বিড় করে বলে –“হুম আমি যদি ছাতাটা এনে দিতে পারি, আমি কি পাব বাবুজি?”

“মানে?”

“মানে আপনি আমায় দেবেন কত?”

“তুই ব্যাটা... তুই চুরি করবি? ওরে আমার বুদ্ধির জাহাজ রে! ওরে চুরি করে আনলে আমি লোককে দেখাব কি করে ছাতাটা? “

মিচকে হাসি হেসে রাজারাম বলে—“লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে। লোকজনকে দেখাতে পারবে না।” তারপর একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলে—“ বা... তেহারিতে গিয়ে সেটাকে লাল রং করিয়ে নিও। সেটা তোমার ব্যাপার। তবে আমাকে তিনটাকা দিতে হবে কিন্তু বলে দিলাম !”

রামভরোসা খানিক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল—“দুটাকা দিতে পারি”

“তিনটাকা”

“দুই”

ঘাড় নাড়িয়ে রাজারাম বলল—“নাঃ ছাতাটার তোমার কোন দরকার নেই দেখছি”

“ধূর মড়া..... যা যা তিন টাকাই পাবি.... ছাতাটা এনে দে”।

এই পাইনবনের মধ্যেই বীণার সাথে ছাতাটার প্রথম পরিচয়। এখন এই বর্ষার মরসুমে পিকনিক করতে কেউ আসে না। ঘাস সবসময় ভেজা ভেজা আর ভেজা পাইনপাতায় পা পিছলে যায় বারবার। গাছের গোড়ায় গোড়ায় ভাঙা ডালে রংবেরংয়ের অথচ বিষাক্ত সব ব্যাঙের ছাতার মেলা। কিন্তু এই সময় সজারু বেরোয় খুব এই ব্যাঙের ছাতার লোভে, আর বীণা তাদের ঝরে পড়া কাঁটার খোজে এই সময় আসে এখানে।

পাহাড়ে সজারুর কাঁটা নিয়ে কেউ মাথা না ঘামালেও, ভারতের অন্যসব জায়গার বাজারে এর খুব চাহিদা। একটাকা করে বিক্রি হয়। রামভরোসা এখানকার ছেলেপুলেদের কাছ থেকে দশ পয়সায় কিনে চালান করে সেগুলো।

বীণা পাঁচখানা কাঁটা পেল, ঘন ঘাসের মধ্যে আরো কিছু পাওয়া যাবে। বীণা ছাতাটাকে একপাশে রেখে ঝুকে পড়ে খুঁজতে লাগল।

রাজারাম এতক্ষণ এই সুযোগেই ছিল গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে। পা টিপে টিপে ছাতাটার কাছে এগিয়ে এলো সে, বীণা ততক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে একটু দূরে চলে গেছে। ছোঁ মেরে ছাতাটা তুলেই রাজারাম ভোঁ দৌড় লাগাল।

পাইনের পাতার ওপরের শব্দ শুনে বীণা পিছনে তাকিয়েই চিৎকার দিয়ে তার পিছনে দৌড়তে লাগল। বীণা ছোটখাট হলেও যথেষ্ট হালকা বলে জোরেই দৌড়তে পারে। কিন্তু রাজারামেরও লম্বা লম্বা ঠ্যাং। তবে উৎরাই বেয়ে দৌড়তে গিয়ে ভুলটা করে বসল এইখানেই লম্বা ঠ্যাঙে লোকেরা চড়াইয়ে যত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে উৎরাইয়ে তার উল্টো। তাও মোটামুটি সে নদীর ধার অবধি পৌছেই গেছিল। এমন সময় কাকতালীয়ভাবে বীজু অন্যপাশ দিয়ে বগলে একগাদা শুকনো ডাল নিয়ে ঐদিকেই এসে পড়ল, বীজু এসেছিল শুকনো কাঠ কুড়োতে । বীণার ছাতাটা আর রাজারামের পিছনে বীণাকে দৌড়তে দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে তার একমূহূর্তও লাগল না। কাঠগুলো ছুঁড়ে ফেলে টেনে দৌড় মারল রাজারামকে ধাওয়া করে । পাথুরে নদীর জলে রাজারামকে ধরে ফেলল বীজূ। রাজারাম লম্বা হলেও বীজুর গায়ে জোর বেশি। রাজারামকে ল্যাং মেরে ফেলে ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে জলের মধ্যে নিয়ে ফেলল বীজু। ছাতাটা তার হাত ফসকে জলের ওপর ভাসতে লাগল। বীণা হাঁপাতে হাঁপাতে ছাতাটা তুলে নিল একটানে।

তারপর ভয়ানক একখান মারামারি বাঁধল বীজু আর রাজারামের মধ্যে। বালির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে, নুড়ির ওপর ঘষা খেয়ে কাদায় মাখামাখি য়ে দুজনেই শেষে হাঁপাতে লাগল, রাজারাম চিৎপাত হয়ে শুয়ে আর বীজু হাটু গেড়ে বসে। শেষে একলাফ দিয়ে বীজু রাজারামের বুকের ওপর হাতদুটো চেপে ধরে বসে পড়ল।

“ছাড়.. ছাড় আমাকে। আমার ঐ ফালতু ছাতাটার কোন দরকার নেই। ছাড় বলছি” – রাজারাম চ্যাঁচাতে লাগল।

“তাহলে চুরি করতে গেছিলি কেন ওটা?” বল?
“ ঐ ... ঐ বুড়ো রামভরোসা....” রাজারাম বলে ওঠে “ঐ বুড়োটাই বলেছিল আমায় ওর জন্য চুরি করে এনে দিতে। না হলে আমাকে দোকান থেকে বের করে দিত”।

অক্টোবর আসতে আসতে বর্ষার মরসুমও চলে গেল। জোঁকদেরও আর পাত্তা পাওয়া গেল না। সূর্যের আলোয় পাহাড়রা আবার ঝলমল করতে লাগল। বীজুর স্কুল আবার আরম্ভ হয়ে গেছে, স্কুল থেকে ফেরার পথে বীজু বাড়ি থেকে আনা ভুট্টাপোড়া চিবোতে চিবোতে আসে। এ বছর ফসল ভালো হয়েছে তাদের।

শীত যদিও আর দূরে নেই। কিন্তু এখানকার লোকদের কাছে মনে হয় অক্টোবরটা বেশ লম্বা মাস। ঘাসগুলো বৃষ্টির জলে ভরা ভরা কিন্তু ভেজা নেই.... আরামে শুয়ে নরম রোদ পোহানো যায়। পাইনগাছের পাতার সুগন্ধ নাকে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়ানোও চলে। মোটের ওপর সবাই বেশ খুশি খুশি। সবাই—কেবল রামভরোসা ছাড়া।

বুড়ো এখন ছাতাটার চিন্তা ছেড়ে দিয়েছে। ঐটার জন্যই যত দুর্ভোগ, দু’চক্ষে দেখতে চায় না আর সেটাকে। সেই ছাতাচুরির ঘটনা জানাজানির পর লোকজন তার দোকানে আর আসে না।

জানাজানির পর, গ্রামের লোকেরা আর রামভরোসার দোকানে আসেনা। বরং কষ্ট করে মাইলটাক হেঁটে তেহারির পৌছবার একটু আগে যে দোকানটা আছে সেখান থেকে জিনিস কিনে আনে।

বুড়ো একা একা দোকানে বসে থাকে, উনুনে চাপানো কেটলিটার হিস্ হিস্ আওয়াজ শোনে। একটা পয়সাও একয়েক হপ্তায় আমদানি হয়নি। যদিও তেহারির একটা ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা জমানো আছে, কিন্তু সেটায় হাত দিতে তার ইচ্ছে নেই।

বীণা আর বীজু দোকানের সামনে দিয়েই যাতায়াত করে মাঝে মাঝেই। বীজু ঘাড় তুলে শিস্ মারতে মারতে দিব্যি চলে যায়। কিন্তু বীণা মুখ নামিয়ে দোকানের দিকে একটুও না তাকিয়ে ছাতার আড়ালে রাস্তাটুকু পার করে.... যেন রামভরোসার এই অবস্থার জন্য সেইই দোষী।

বীণা নিজেই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ছাতাটা তো তারই জিনিস, অন্যেরা যদি হিংসা করে এটাকে দেখে তাহলে তার কি দোষ? .... কিন্তু ছাতাটাকে কি সে একটু বেশিই ভালোবেসে ফেলেছে? মানুষজনের থেকেও সেকি ছাতাটাকেই বেশি পছন্দ করে?

রামভরোসার যা হয়েছে সব বুড়োর নিজের দোষে। কিন্তু তাও..... বীণার খারাপ লাগে তাকে দেখে.... বুড়োর জন্য নয় নিজের জন্য।

অক্টোবরের শেষের দিকে বীণার হাতে তখন দশ পয়সা মতন এসেছে। বীণা মন স্থির করে সোজা চলে গেল রামভরোসার দোকানে—টফি কিনতে।

গত তিন হপ্তার মধ্যে বুড়োর একমাত্র খরিদ্দার....বুড়ো ভুরু কুঁচকে দেখে বীণাকে। সেই ছাতা দেখিয়ে আবার কি তাকে জ্বালাতে এলো বীণা? বীণা পয়সাগুলো বাড়িয়ে দিয়ে টফির বয়ম দেখিয়ে দেয়। রামভরোসাও কিছু না বলে টফি বের করে বীণার হাতে দিয়ে দেয়।

টফি নিয়ে বীণা বেশ খানিকটা চলে যাবার পর রামভরোসার চোখে পড়ল ছাতাটা তার কাউন্টারের ওপর ফেলেই বীণা চলে গেছে।

ছাতাটা তার হাতের মুঠোয় ! তুলে নিয়ে দোকানের পিছনে লুকিয়ে রাখলেই হোলো। কেউ জানবে না তার কাছেই আছে ছাতাটা !

ছাতাটাকে মুঠো করে তুলে নিয়ে খুলে ফেলল সেটাকে। রং এখন অনেকটা সাদা হয়ে এসেছে। “কিন্তু আমি তো কখনো বাইরে বেরোই না... করবটা কি আমি এইটা নিয়ে?”

নিজের মনে বলেই বুড়ো ছাতাটা নিয়ে দৌড়ে গেল দোকানের বাইরে।

“বীণা ... বীণা” চেঁচিয়ে বীণাকে ডাকল বুড়ো “তুই ছাতাটা ফেলে গেছিস রে”

দৌড়তে খুব একটা পারে না বুড়ো এই বয়সে। তাও তাড়াতাড়ি গিয়ে বীণার সামনে ছাতাটা বাড়িয়ে ধরে বুড়ো—"তোর ছাতা, ফেলে যাচ্ছিলি তো !"

বীণা চুপ করে রইল, তারপর মাথা নেড়ে বলে উঠল—"তোমার কাছেই রাখ ওটা। আমার আর দরকার নেই ছাতাটার।"

রামভরোসা থমকে গেল খানিকক্ষণের জন্য তারপর জোর দিয়ে বলে উঠল—"কিন্তু... কিন্তু... এত সুন্দর ছাতাটা তুই রাখবি না তোর কাছে?... সারা গ্রামের সবথেকে সুন্দর ছাতা?"

"জানি" বীণা বলে "কিন্তু ছাতাই তো আর সবকিছু নয়"

ছাতাটা বুড়োর হাতেই ধরা রইল। আর বীণা উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল ধীরে ধীরে। এখন তার আর নীল আকাশের মাঝখানে ছাতাটা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

এখন বুড়ো রামভরোসার কাছেই থাকে ছাতাটা। বুড়ো সবাইকে বলে বীণা এটা উপহার দিয়েছে তাকে। ছাতাটা পাবার পর এখন কেমন যেন বাইরে ঘুরে বেড়াতে মন হয় বুড়োর। মাঝে মাঝেই ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়ে হাঁটতে। ছাতাটা দোকানের দাওয়ায় খোলাই থাকে সবসময়। যে কেউ এসে ধার নিতে পারে ছাতাটা দরকারে; তো একদিক থেকে এখন সেটা গ্রামসুদ্ধু সবার ছাতা।

শীত পড়বার কয়েকরাত পর এক রাতে রামভরোসার দোকানে ভালুক হানা দিল। ভারী বরফ পড়ায় খাবারের খোজে এসেছিল ভালুকটা। টিন বেয়ে ভালুকটা ছাতে উঠেছিল... আর ছাতে লতানো কুমড়ো গাছ থেকে দুখানা কুমড়ো খেয়ে গেছে। কিন্ত সকালে রামভরোসা দেখল টিনের ছাতে বেয়ে উঠতে গিয়ে ভালুকটার একটা নখ খসে গেছে, চালের ওপরে পড়ে আছে সেটা।

পরের দিনই রামভরোসা চলল তেহারিতে সেই নখটাকে পকেটে করে। সেখানে গয়নার দোকানে গিয়ে কারিগরকে কি সব বুঝিয়ে আবার ফিরে এলো সেইদিনই।

সাতদিন পর আবার গেল রামভরোসা। এবার সেই কারিগরের থেকে রূপোর চেনে ঝোলানো রূপা বাঁধানো নখটাকে আনতে। বীণার গলায় ভালো মানাবে এইটা... বাঘনখ না পাওয়া গেল.. ভালুকের নখও মন্দ কি?

ট্রামের ভিড়ে

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এক সরকারি অফিসে নটা থেকে পাঁচটা অবধি কেরানীগিরি করে বাড়ি ফেরার পালা এলেই বুকটা কেমন ঢিপঢিপ করে। আসন্ন আতঙ্কের ছবিটা স্পষ্ট ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

আমার বাড়ি ফেরার দুটো উপায়।

এক, পায়ে হেঁটে শেয়ালদা স্টেশন, তারপর ট্রেন ধরে আরো এক ঘণ্টার পথ। আর দুই, বাস কিম্বা ট্রাম ধরে মাঝপথের কোন রেলস্টেশনে পৌঁছে যাওয়া। অবশ্য যানবাহনের যা দশা, হেঁটে গেলেই কিন্তু সময় বাঁচে।

ট্রাম আসতেই দেখি ঠাসাঠাসি ভিড়। তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই দাঁড়িয়ে। আমিও। অথচ বসতে যে কি ভীষণ ইচ্ছে করছিল কি বলব। পরিশ্রান্ত বা দুর্বল বলে নয়। আমি ছাড়া আর সবাই বসার জায়গা পেয়েছে দেখলেই আমি যেন বরাবরই আরো বেশী রকম ক্লান্তি বোধ করি।

আজ কোন রকমে ঠেলেঠুলে, কস্তাকস্তি করে বসার সিটের কাছে গিয়েই মেজাজটা রীতিমত খাট্টা হয়ে গেল । বসার জায়গা সব আগে থেকেই দখল হয়ে গেছে। মনের ক্ষোভের কারণ কিন্তু সেটা নয়। সুযোগটা বেহাত হয়ে গেল বলে রাগ হোল। ভেবেছিলাম, আমি একটা খালি সিটে বসব, আর মৌকা পেলে সেই সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাউকে অমায়িক ভদ্রতা দেখাব।

যাঁকে বসতে দেব কেবল তিনিই যে কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠবেন তা নয়, যাঁরা আমার এই নিঃস্বার্থ ঔদার্য থেকে বঞ্চিত হবেন, তাদের চোখেমুখে ঈর্ষার ছোপ লেগেছে দেখে আত্মতৃপ্তিও বোধ করব ।

আজ সব গুবলেট হয়ে যাবে নাকি ? আমার সামনের সিটখানায় যিনি জাঁকিয়ে বসে আছেন তিনি অবশ্য সেই বিচিত্রেরই দলে পড়েন, যাঁদের নিয়ে যুগে যুগে কত কবি কত অমর কাব্য রচনা করেছেন, অতুলনীয় কত সব ভাস্কর্য গড়েছেন কত না শিল্পী। আমি কবিও নই, শিল্পীও নই।

সিটটা খালি পাওয়া গেলে আমিও তো একটু ভদ্রতার আদিখ্যেতা দেখিয়ে বাহবা পেতে পারতাম। আর ট্রামযাত্রার ধকলও একপলকে উবে যেত। তবে একটাই শর্ত, আমার ছাড়া

সিটটা পেতে হলে, আপনাকে মহিলা হতে হবে আর আমার সিটের কাছে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আজ ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে। আর আমার সামনে যুবতী মহিলাটি বসে। অপাঙ্গে আমি মহিলাটিকে অপলক দেখলেও এমন ভান করছি যেন তাকিয়ে আছি জানলার বাইরের দিকে। তবু আমি অনুভব করছি, যুবতী আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন। এতক্ষণ চোখে চোখ পড়েনি, তাই কেউ কারুর মনের কথার সঠিক বিশ্লেষণ খুঁজে পাচ্ছিনা। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর দৃষ্টি শুভ হল, ব্যস, ঘটে গেল অঘটন। যুবতী সটান উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে আমায় নিজের বসার জায়গাটা ছেড়ে দিতে চাইলেন। যুবতীকে গর্ভবতী দেখেও যেন একটুও অবাক হইনি এমন একটা ভাব দেখিয়ে জানতে চাইলাম, কি ব্যাপার? এইখানে নামবেন নাকি? উঃ! আজ যা ভিড়, ধকলের অন্ত নেই। সাবধানে নামবেন কিন্তু।

যুবতী হেসে বললেন, না, না, নামবো কেন। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার এত ধকল সইবে না। তাছাড়া আজ যা ভ্যাপসা গরম! হার্টফেল হয়ে যাবে। আপনি বুড়োমানুষ।

বুকের বাঁদিকের পকেটে পরখ করতে চেয়েছিলাম ট্রামের মান্থলি টিকিটটা আছে কিনা। তাই দেখে হয়ত মহিলা ভাবলেন আমার বুকে ব্যথা উঠেছে। সে যাই হোক, বসার জায়গা তো পেয়ে গেছি। হিজিবিজি চিন্তা করে সময় নষ্ট করি কেন? কথা না বাড়িয়ে মহিলার কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে জাঁকিয়ে বসলাম মহিলা সিটে। অন্য যাঁরা দাঁড়িয়ে তাঁদের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, কেউ এ ব্যাপারে আদৌ ঈর্ষাবোধ করছে কিনা। কাউকে তেমন উসখুস করতেও দেখলাম না।

কেন জানিনা, ছেলেবেলার দুটো কথা মনে পড়ল। মায়ের সঙ্গে ট্রামে করে কোথাও গেলে দাঁড়িয়ে থাকি তবু সই, হাজার চেষ্টাতেও মা আমাকে নিজের পাশে লেডিস সিটে বসাতে পারতেন না। এ মা, আমি মেয়েদের পাশে বসব কেন, আমি না ব্যাটাছেলে। আঁতে ঘা লাগবে যে।

আর মনে পড়ল বড়মামার কথা। জাঁদরেল মিলিটারি অফিসার। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর দিন দিন কেমন যেন বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তবু কেউ যদি ভুলেও সেকথা মনে করিয়ে দিত, তাহলে

আর রেহাই ছিলনা। সঙ্গে সঙ্গে একহাত পাঞ্জা লড়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন কার কতো বয়স।

এবার থেকে আমিও বুড়োদের দলে পড়ে গেলেও বড়মামার মত ব্যবহার দেখাবার চেষ্টা করলাম না।

দিনে দিনে বয়সটা যে বাড়ছে, নিজের থেকে সেটা যেন ঠিকমতো উপলব্ধিই করা যায়না। রোজ যাঁদের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, তাঁরাও হয়ত টের পান না, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কিভাবে বয়স বাড়ছে।

কবে, কাকে, ঠিক কোন মুহূর্তে বার্ধক্য এসে সোহাগে গলা জড়িয়ে ধরবে তা আগে থেকে জানান দেয় না। গায়ের চামড়ায় ভাঁজভোজ পড়তে দেখলে মলম টলম দিয়ে তা ঢাকা দেবার আমরণ কতো করসত, কেরামতি চলে। অন্য কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে যেন একথা ভাবতেও ইচ্ছে করেনা।

আচ্ছা, মহিলাটির আজ বাচালপনা না করলে চলছিল না? সদ্য হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলে। এক ঘায়ে আমার সর্ব গর্ব খর্ব করে দিলে। ঠুনকো কাঁচের চুড়ির মত খানখান হয়ে গেল আমার সকল অহংকার।

তবে আজ থেকে এটাও ঠিক হয়ে গেল, ভবিষ্যতে বসার জায়গা পেলে আর কোনদিন আমায় উঠে দাঁড়াতে হবে না। লেডিস সিট হলেও না। সামনে মহিলারা দাঁড়িয়ে আছেন দেখলেও উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জায়গায় বসতে বলার আদিখ্যেতার ভদ্রতাও দেখাতে হবে না। সে বয়স তো আর নেই। এখন আমি আর কেওকেটা নই। আমি এখন আর সবার মত অতি সাধারণ মানুষ, ক্রমশ অথর্বের দিকে ঝুঁকে পড়ছি। আজ থেকে আমার জীবনের কি এক ঘোর দুঃসময়ের সূত্রপাত।

শুধু একটাই প্রবোধ আমার। অধিকাংশ মানুষ সভ্য আর ভদ্র বলে আমি আরো বেশ কিছুদিন তাঁদের সৌজন্যে তরতাজা অবস্থায় দিন কাটাতে পারব। অন্তত ট্রামে বাসে বসার জায়গা না পেলে কেউ না কেউ উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বসার অনুরোধ জানাবে। যে সিটেই বসি না কেন আমাকে উঠে দাঁড়াবার তাগাদা শুনতে হবে না। আমি বসে থাকব গ্যাঁট হয়ে। আশেপাশে যে

দেবাদেবিই থাকুন না কেন। আর হ্যাঁ, যদি কোনদিন উঠে দাঁড়াবার দুর্বলতা দেখাই, তাহলে বুঝতে হবে, যাঁর জন্যে উঠে দাঁড়ালাম, তিনি হয় আমার চেয়েও থুড়থুড়ে, নয়ত সত্যি কোনও ডানাকাটা পরী।

[জার্মান সাহিত্যিক Heinrich Spoerl (১৮৮৭-১৯৫৫) লিখিত স্কেচ "Strassenbahn" এর অনুপ্রেরণায়...]

আমার গাড়ি চালানো, সৃজন আর ফেসবুক

পারভীন রহমান

ইমিগ্রেশেনের কাজে দুই বছরের জন্য নিউজিল্যান্ড থাকবো এটা যখন ঠিক হলো তখন মনে প্রশ্ন এলো ওখানে যাতায়াতের কাজে কি যানবাহন ব্যবহার করবোসুতরাং ! চালাতে জানতে হবে গাড়ি নাহলে রাস্তাঘাটে চলাচলে অসুবিধায় পড়তে হবে।

এক শীতের সকালে চায়না বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের মাঠে শুরু করলাম আমার গাড়ি চালানো প্রশিক্ষণ। আমি বরাবরই ভীতু টাইপের মানুষ,রাস্তা পার হতেই ভয় পাই,গাড়ি চালানো তো দূরের কথা। কিন্তু পড়েছি যাঁতাকলে --- কি আর করা !!

প্রশিক্ষক হলেন আমাদের ড্রাইভার "সোহরাব ভাই" যাকে আমি এবং আমার ছেলে সৃজন দুজনই ভাই বলে ডাকি। প্রশিক্ষণের তিন দিন পর সৃজনের কৌতুহল জাগলো তার ভীতু মা কিভাবে গাড়ি নামক যন্ত্রটিকে চালায় দেখবে। আমিও খুব উৎসাহ দেখিয়ে নিয়ে গেলাম সৃজনকে যে দেখুক তার মা সেই ভীতু মা নেই আর।

গাড়ি চালানো সবে শুরু করেছি,সৃজন কমেন্ট করলো,"মা,তুমি কি ভাবে গাড়ি চালাচ্ছো,তোমার তো স্টিয়ারং হুইল ধরাই ঠিক হয় নি!" ছেলের কথা শুনে আমার তো আক্কেল গুড়ুম! সোহরাব ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম ঘটনা কি সত্যি না মিথ্যা,তিনি লাজুক হেসে উত্তর দিলেন,"জ্বি ভাবী, ঘটনা সত্যি",আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারলাম না - শিক্ষক যদি ছাত্রীকে ভয় পায় তাহলে শিক্ষার মান কি হবে?

একদিন সকালে,আমি মাঠের পাশের রাস্তায় গাড়ি চালানো শুরু করলাম। আমার মতো অনেকেই শিখছে ওখানে,আমি রাস্তা পার হয়ে সম্মেলন কেন্দ্রের পাশ ঘেঁষে যে ছোট জায়গাটা দিয়ে মাঠে ঢুকতে হবে,সেখানে ডানদিকে মোড় নিতে গিয়ে দেখি অন্য একটি লাল রংয়ের গাড়ি বের হচ্ছে। আমি নার্ভাস হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম ব্রেক এবং দ্রুত বাঁয়ে মোড় নিলাম সংঘাত এড়ানোর জন্য।

বিকট শব্দে চোখ খুললাম। না বাবা বাঁচা গেল। লাল গাড়ি ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে। তাহলে কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়নিকিন্তু সামনে !র ছোট ছোট পিলারগুলি ভাঙলো কিভাবে? গাড়ির উইন্ডশীল্ডেও ঝুলে আছে ভাঙা পিলারের অর্ধেক!

আমি ড্রাইভারকে বললাম,এগুলো কিভাবে হলো? ড্রাইভার হেসে ফেলে বলল, "ভাবী,আপনি বিপদ দেখলে ব্রেকে চাপ না দিয়া একসিলেটারে চাপ দেন সবসময়। ভাগ্য ভাল অল্পের উপ্রে বাইচা গেছি। আপনার গাড়ি চালান শেখনের কাম নাই। চলেন বাড়িত যাই গা।"

সেদিনের মতো বাড়ি ফেরত গেলাম পরে আমার স্বামীর কাছেই শিখে নিয়েছিলাম গাড়ি চালানো।

আমার ছেলে সৃজনের বয়স তখন আড়াই,একদিন ইফতারের সন্ধ্যায় আমরা সবাই বসে আছি আজানের অপেক্ষায়, ছেলে আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করছে মা খাচ্ছ না কেন? আমি জবাব দিলাম রোজা ভেঙে খাব বাবা। ছেলে আমার দৌড়ে গিয়ে ওর খেলনা কাঠের হাতুড়ি এনে বলল - এই যে হাতুড়ি এনেছি এবার রোজা ভাঙো।

আরেকদিন ওর কাজিনরা এসেছে,সবাই ছাদে যাবে,সৃজনও যেতে চায়,একজন বলল তোমার মায়ের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে এসো তাহলে নিয়ে যাবো। সৃজন আমার কাছে এসে হাত পেতে বলল - মা রুবাইতু আপু বলেছে তুমি পারমিশন দিলে আমাকে ছাদে নিয়ে যাবে,আমাকে পারমিশন দাও।

আমি বললাম ঠিক আছে পারমিশন দিলাম।ছোট মানুষ ভেবেছে পারমিশন কোন বস্তু তাই আমি যতই বলি পারমিশন দিয়েছি,সে ততোই কাঁদে আর হাত পেতে বলে - পারমিশন দাও পারমিশন দাও।
আমি ওর কান্ড দেখে হাসি থামাতে পারছি না,শেষে ওর কাজিনরাই ওকে উদ্ধার করে ছাদে নিয়ে গেল !!

২০০৫ সালের কথাআমার এক হাই ফাইভ বন্ধু ফে...সবুকে নিবন্ধন করার নেমন্তন্ন জানালো। কিছুটা বুঝে আর কিছুটা না বুঝেই নিবন্ধন করলাম ফেসবুকে। তবে সেখানে আর কখনো যাওয়ার তাগিদ অনুভব করিনি।

২০০৬ সালে প্রবাস জীবনে বসে দেশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য আন্তর্জালের মাজেজা বুঝতে পারলাম। তখন খুঁজে বের করলাম সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার ওয়েবসাইট ফেসবুক। দেখলাম আমার সেই অ্যাকাউন্টটি বহাল তবিয়তে আছে এবং অনেক ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ঘাপটি মেরে বসে আছে। নতুন সাইট এবং দেশের সাথে আপডেটেড থাকা যাবে তাই সবাইকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলাম সানন্দে,এমনকি কেউ মেসেঞ্জারে রিকোয়েস্ট পাঠালেও তা অ্যাকসেপ্ট করছি দেশের টানে।

তখন তো আমি কেবল বন্ধু খুঁজে বেড়াই,পরিচিত কাউকে পেলে খুশি হয়ে যাই। ফেসবুকের ইনটারেস্টেড ইন অপশনটিতে লিখলাম ইনটারেস্টেড ইন মেন এন্ড :উইমেন। একদিন মেসেঞ্জার ওপেন করার পর দেখলাম সিডনি থেকে এক ফেসবুক বান্ধবী আমাকে অফলাইন মেসেজ দিয়ে রেখেছে আমার সাথে কথা বলতে চায়। তার আগ্রহ দেখে খুশি মনে টাইম সেট করে একদিন চ্যাট করতে বসলাম। পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পর দেখি মেয়ে কি যেন বলতে চায়। আমি তার কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে বলে ফেললাম - যা বলবে স্পষ্ট করে বলো।

সে যা বলল তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম ! মনে হচ্ছিল কাঁ কাঁ চে প গে (কাঁদতে কাঁদতে চেয়ার থেকে পড়ে গেলাম)। ঐ মেয়ে দেখেছে আমি ইনটারেস্টেড ইন ওমেন লিখেছি ফেসবুকে তাই ... ...আমার সাথে ইয়ে মানে... কি যে সে বলেছিল মনে নাই। নাউজুবিল্লাহ্!!

আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম যে তুমি ভুল বুঝেছ। মেয়ে তখন কয়েকবার সরি বলে মানে মানে কেটে পড়ল আর আমি নতুন এক তথ্য আবিষ্কার করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। ফেসবুকের গুষ্ঠির নিকুচি করে বলে ফেসবুকে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। ওহহহ সাথে সাথে ইন্টারেস্টেড অপশনটা পাল্টে দিতে ভুলি নাই।

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে

অদিতি কবির খেয়া

বিয়াল্লিশ বছর পর আজকে দেশ রাজাকার আর স্বাধীনতার পক্ষের মানুষে ভাগ হয়ে গেছে। বিয়ের সময় পাত্র/পাত্রী বিবেচনা করতে দেখেছি রাজাকারের পক্ষ-বিপক্ষ তুলাদণ্ডে, চাকরির ইন্টারভিউতে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে শুনেছি, সাভারে বহুতল ভবন ধ্বসে মৃতা মায়ের সন্তানকে দত্তক দেবার সময় প্রশ্ন করা হয় গণজাগরণ মঞ্চ বা শাহবাগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন কিনা। নিজে দেখেছি সংবাদপত্র বিক্রি করেও ক্রেতা শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে কটুক্তি করায় বিক্রেতা বিক্রি করা সংবাদপত্র ফিরিয়ে নিচ্ছে।

তথাকথিত ইসলামের সৈনিকদের সাথে 'নাস্তিক'দের এই লড়াইটা লাগতই। এটা অনেক আগেই হয়ে যেত, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা নামক বানরদের মধ্যে ক্ষমতা নামক পিঠার ভাগাভাগির জন্য জামাতে ইসলামি বাংলাদেশ (আমার এক বন্ধু বলে- ঝামা হাতে পিছলামি) যা আদতে রাজাকারে পাকিস্তানকে সবাই কাছে রেখেছে। আমার কিন্তু সব সময় মনে হত এমন একটা সংঘাত লাগবেই। শুভ বুদ্ধির সবাই তো আর মরে যাবে না কেউ না কেউ প্রতিবাদ করবেই।

হুমায়ুন আযাদ লিখেছিলেন 'আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।' ২০১৩-তে বসে ১৯৭০-এর শুরু থেকে ১৯৮০-র মাঝামাঝি পর্যন্ত অন্যদের সময় বলতে পারি। নাম জিজ্ঞেস করে সবাই বলতো- কি সুন্দর নাম! সেই সুন্দর নাম কিভাবে যেন হিন্দু নাম হয়ে গেলো! কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে হিন্দু নাম কেন রেখেছে আমি আহাম্মক হয়ে যাই। ধন্যবাদ জানাই আম্মাকে। ভাগ্যিস আম্মা আমাদের চার ভাই-বোনের এমন সুন্দর নাম রেখেছিল তাই তো বহু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের সাম্প্রদায়িক চেহারাটা দেখতে পাই।

এমন তো ছিল না, তাহলে কিভাবে হল? রাজনীতিবিদরা নিজেদের গদি পোক্ত করতে ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার ফলেই অবস্থা এমন। এটা বোঝার জন্য রকেট ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার পড়ে না। আর ধর্ম ব্যবহারকারী এই রাজাকার দলের লক্ষ্য যেনতেনভাবে ক্ষমতা দখল। নাহলে দেশের এই বিপুল জনগোষ্ঠির এত সমস্যা নিয়ে কথা না বলে কেন মেয়েদের কাপড় চিন্তাভাবনা

করে? পাকিস্তানী ব্রান্ডের ইসলাম আজকে পাকিস্তানকে কোথায় নিয়ে গেছে তা দেখেও যদি বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের শিক্ষা না হয়, তাহলে কিভাবে শিক্ষা হবে জানি না।

আমার বোনকে প্রায়ই বলি- আমাদের জীবন তো একভাবে কেটেই গেল। তোমাদের জীবন যে কিভাবে কাটবে। আবার শাহবাগ আন্দোলনের ছেলেমেয়েদের দেখলে ভরসা পাই। মনে হচ্ছে একটা রাত পার করছি ভোরের দেখা নাই।

আমি এবং সুকুমার

অনুস্মৃতি মজুমদার

"এ সব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা"...

ছোটবেলার সেই আধা বোঝার ভার আজও পুরো বোঝা হলনা। শিশুমনকে কিভাবে যে সুকুমার তাঁর মজারু ছড়া-ছবি দিয়ে ঘিরে ফেলেছিলেন সেটা কোনদিন বুঝতে পারিনি। আজও যখন বাড়ির পাঁচিলে বসে থাকা দুই হুলোর ঝগড়া বা মারামারি দেখি তখন মনের মধ্যে খিল্লিখিল্লির মুল্লুকে দুই বেড়ালের ঝগড়াটাই ফুটে ওঠে সবার আগে। সুকুমার রায় তাঁর সহজ লেখনী দিয়ে অবলীলায় আমাদের বুঝিয়েছিলেন কি ভাবে সৃষ্টি হতে পারে হাতিমি কিংবা হাঁসজারু। সুকুমার রায়ের এই ব্যাকরণ না মানার কারনেই মনের চিন্তা ঘোরার বা মনের নাচের শব্দ জানতে পারি। এছাড়া নানা রকম অদ্ভুত দর্শন জন্তুজানোয়ারের বিবরণ আমরা পাই আবোল তাবোলে। যেমন ট্যাঁশগরু হারুদের অফিসে থাকে জানার পর তাকে খুব দেখার ইচ্ছে হত। অথবা কিম্ভূত, যার সব জন্তুর, পাখির সব গুণ, সব রূপ চাই। কিন্তু সব পেয়ে যাওয়ার পর সে অনুভব করে নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ বিচ্ছু, মৌমাছি, প্রজাপতি, নই আমি কিচ্ছু। এছাড়াও কুমড়োপটাশ, ষষ্টিচরণ, কাঠবুড়ো আরও অনেক চরিত্র জড়িয়ে ধরে আমার বেড়ে ওঠা।

সুকুমারের আরেক সৃষ্টি 'হ য ব র ল' পড়তে বসলে মনে হয় এর প্রতিটা চরিত্রের উদাহরণ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। টাকা দিয়ে সাক্ষী কেনা বা নির্দোষ নেড়াকে শাস্তি দেওয়া সবই আজকের সমাজের সাথে কোথাও যেন মিলে যায়। হ য ব র ল-র বিচারক পেঁচা, যে দিনের বেলায় ঘুমায় অর্থাৎ দিনের বেলা সে প্রায় অন্ধ সেও কি আজকের দিনের কোন জজ বা উকিলের চরিত্রের অনুরূপ নয়? এখনও যখন হ য ব র ল পড়ি তখন পড়তে বর্তমান সমাজের বিশেষ করে আদালত দৃশ্যের সাথে আজকের বিচার ব্যবস্থার সাথে অদ্ভুত মিল খুঁজে পাই।

‘অবাক জলপান’ নাটকের সেই ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত পথিক যে সারাদিন ধরে এক গ্লাস খাওয়ার জল চেয়ে ফিরছে জনে জনে। তার পরিবর্তে দীর্ঘ সময় ধরে শুনতে হয়েছে জল সম্পর্কিত দীর্ঘ বক্তৃতা। কোন তরুণ কবির মিল খুঁজে পাওয়া কবিতা, কোন বৈজ্ঞানিকের জল সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল। কেউ আবার তার মামার বাড়ির জলকে খারাপ বলার অপরাধে মুখের ওপর জানালা বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত পথিক প্রায় জল ভর্তি গ্লাস কেড়ে নিয়ে জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে।

‘ঝালাপালা’ নাটকের সেই সমাজের জমিদারদের আর তার মোসাহেবেদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ আমাকে নাড়া দিয়ে যায়। এই নাটকে খুব অল্প হলেও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আজকের দিনে স্কুল কলেজে পড়াশুনার পরিবর্তে যে ধরনের কার্যকলাপ চলছে তার সামান্য কিছু নিদর্শন নাটকটিতে পাওয়া যায়।

সুকুমার রায় তাঁর সহজ লেখনীর মাধ্যমে গ্যালিলিও, ডারউইন, সক্রেটিস ইত্যাদি মনিষীদের জীবন সম্বন্ধে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন।

সুকুমারের নানান ছোটগল্প পড়তে বসলে সেই ছোটবেলায় ফিরে যাই বারে বারে, হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলাকে বোধ হয় সুকুমার ছাড়া আর কেউ-ই এই ভাবে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

দুই বিঘা জমির পরবর্তী সংস্করণ ‘একটি মুদিখানার দোকান’

রাজু মজুমদার

অদ্ভুত একটা গল্প বলব। ছোটবেলায় পড়া কবিগুরুর ‘দুই বিঘা জমি’র সাথে যার খুব মিল,প্রথমে তো ভেবেছিলাম গল্পে নাটকীয়তা আনার জন্য যে করেই হোক দুই বিঘা জমি ব্যাপারটা আনব (সেই ছোটবেলায় যেমন হত, যাই রচনা লিখতে দিক না কেন আমি সেই কুমিরেরই রচনা লিখবো!!!) কিন্তু কবিগুরুর অবমাননা হওয়ার ভয়ে সে দুর্বুদ্ধি বাদ দিলাম। তবে ‘উপেন’ আর ‘জমিদার’ সাহেব কে বাদ দিতে পারলাম না! বোধ করি সর্বহারার সাথে উপেনের একটা অদৃষ্টগত যোগ আছে। আর জমিদার ছাড়া শোষকরূপের আর কাকেই বা মানায় !!!

সে অনেককাল পূর্বের কথা আজি হইতে প্রায় বিংশতি বৎসর তো হইবেই। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের রাউজান নামক জায়গায় এক মামা ভাগ্নে বাস করিত। মামার সেখানে ছোটখাট একখানি ঘৃতের ব্যবসা ছিল, ভাগ্নের সংস্থান মামার তুলনায় খারাপই বলা চলে। মা মারা যাওয়ার পরেও মাতুলের সাথে সর্ম্পকের বিচ্ছেদ তখনও হয় নাই। ভাগ্নের বাটিতে বৃদ্ধ পিতা ব্যতিরেকে আর কেউই ছিল না, কোনক্রমে একটি মুদির দোকান চালাইয়া তাহাদের অন্নসংস্থান হইত। তখন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তুমুলে উঠিয়াছে, মামা আপনার ধন প্রাণ বিধর্মীদের হাত হইতে বাঁচাইবার তরে বড়ই কাতর হইয়া উঠিলেন।

এমতাবস্থায় একদিন মামা ভাগ্নেকে ডাকিয়া কহিলেন- ‘ভাগ্নে, অবস্থার গতিক তো ভালো বোধ হইতেছে না, শেষে কি এই পোড়া দেশে ধনে প্রাণে মারা পড়িব?? মুখাগ্নি করিবার তরেও কেহ থাকিবে না??’

ভাগ্নেও বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া বড়ই শঙ্কিত ছিল। হোক ক্ষুদ্র,নগণ্য দুইখান প্রাণ,তবুও প্রাণ তো বটে!মুখ শুষ্ক করিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেই মামা আবার বলিলেন- ‘ভাগনে আমি বলি কি তোমার মামী আর বাচ্চা দুটোকে লইয়া তুমি আর তোমার পিতৃদেব ভারত পাড়ি দাও। এই পোড়া দেশের ছায়াও যেন আমার নিষ্পাপ সন্তানের উপর না আসে’

ভাগ্নে অকস্মাৎ ঘটনাবর্তে হতচকিত হইয়া গিয়াছিল,সম্বিত ফিরিয়া পাইতেই কহিল ‘মামা আমার ক্ষুদ্র প্রাণ এইখানেই কোনমতে কষ্টে দিন কাটিয়া যায়, বিদেশ বিভূঁইয়ে কি করিয়া দিনপাত করিব বল??’

মামা আশ্বাস দিয়া কহিল ‘সে তুই চিন্তা করিস নে তোর আর তোর পিতার ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার। তোর হাতে ছাড়া কাকেই বা আমি ভরসা করিয়া আমার সন্তানের ভবিষ্যত তুলিয়া দিয়া সান্ত্বনা লইব বল??’

আলোচনামত উপেন মামার আশীর্বাদী সম্বল করিয়া ও মামী আর ছেলেমেয়ে দুটিকে সঙ্গে লইয়া এবং আপন সহায়সম্পত্তি জলের দরে বিকাইয়া বৃদ্ধ পিতৃদেবের সাথে একূলে পাড়ি দিল। মামা তাহাদের চোখের জলে বিদায় দিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আপনার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে উপেন প্রথমে কলিকাতার মধ্যমগ্রাম নামক জায়গায় আসিয়া একটা বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে লাগিল। মামার ছেলেমেয়ে দুটোকে স্কুলে ভর্তি করাইয়া মামার পাঠানো টাকায় মামীদের বসবাসের দরুণ একখানা বাটী বানাইতে লাগিল উপেন। মামা ও মামী যুগপৎ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে নবনির্মিত বাটীতে ভাগ্নেকে মুদির দোকান করিতে দেবেন। উপেনের মুষ্টিমেয় ধন খুব দ্রুতই মা ভবানীর ভাঁড়ারের মত শূন্য হইতে লাগিল। তাই সে দিনরাত ব্যাপী চেষ্টা করিতে লাগিল কি করিয়া বাটীখানা তড়িঘড়ি বানাইয়া বাকী যাহা হাতের পাঁচ পড়িয়া আছে তাহা দিয়া দোকান করিবে। যথারীতি বাটী নির্মানের অবসান হইল, উপেন তাহার একধারে তাহার ক্ষুদ্র দোকানখানি খুলিয়া বসিল এবং অদূরে একখানি বাসা ভাড়া করিয়া বৃদ্ধ পিতৃদেবের সাথে জীবনপাত করিতে লাগিল। মামা বৎসরে দুই-তিন বার করিয়া একূলে আসিয়া তাহাদের দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং ওপারে আপন ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইলেন নিশ্চিন্ত হইয়া! যথারীতি ছেলেমেয়ে দুটি একূলের আবহাওয়ায় বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। এমতাবস্থায় মামী স্বামীর কষ্ট লাঘব করার এক অভূতপূর্ব উপায় নির্ধারণ করিলেন। তিনি ঋত্বিক হইয়া দেশে দেশে এই মহাধর্ম প্রচারে আত্মনিবেশ করিলেন এবং বলাবাহুল্য যজমানদের কাঞ্চনমূল্যে আপন ঝুলি ভারী করিতে লাগিলেন। কিন্তু তত্ত্বাবধানের অভাবে তাহার ছেলেমেয়ে দুটিই উচ্ছন্নে গেল। মেয়েটি নাকি শোনা

যায় পাশের বাড়ির ছেলেটির সহিত প্রেম করিতেছে,আর ছেলেটি পাড়ার মস্তানদের সহিত রীতিমত গলায় গলায় ভাব জমাইয়া তুলিয়াছে! দুর্জনের বলে ছেলেটির হস্তে নাকি তাহারা ঘোড়াও দেখিয়াছেন! মামী যদিও বা বিশ্বাস করেন না তবু তাহার অবোধ শিশুপুত্রের নামে এই অপবাদ কিন্তু উপেনের মারফত ওপারে রটিয়া যাওয়ায় তিনি খুবই অস্বস্তিতে পড়িলেন। মামী তখন এই অস্বস্তির কারণরূপে উপেনকেই দোষী মনে করিলেন এবং ল্যাঠা চুকাইয়া দিবার জন্য উপেনকে দোকান থেকে উৎখাত করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমত উপেন তো এই আকস্মিক বজ্রাঘাতে হতচকিত হইয়া গেল। বলিতে ভুলিয়াছি উপেন এখন বিবাহিত, চার বৎসরের তাহার একটি কন্যাও সংসারে আসিয়াছে। এমতাবস্থায় মামীর কথায় তাহার দুনিয়া ঘুরিতে লাগিল। ডুবন্ত ব্যক্তি যেমন খড়কুটো ধরিয়া বাঁচিতে যায় তেমন উপেনও মামীকে তাহাদের প্রতিশ্রুতি মনে করাইয়া দিল। কিন্তু মামী এতদিন মিছে একুলের জল খায় নাই, তিনি উপেনকে মনে করাইয়া দিলেন বাটী এবং জমিনের দলিলে কোথাও উপেনের স্বত্বাধিকার উল্লেখ করা নাই উনি বরং দয়াপরবশ হইয়া তাকে এতদিন দোকান করিতে দিতেছিলেন,বর্তমানে দোকানখানা তাহার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে জামাইকে উপহার দিতে চান,তাই উপেনকে উঠিতে হইবে। যদিও জামাই হিসেবে সেই পাশের বাটীর ছেলেটিই, যাহার সহিত তাহার মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করিতেছিল সেই দোকানখানি পাইবে কিনা বলেন নাই।

পরবর্তীতে যাহা ঘটিল তাহা অননুমেয় নহে! সকল গরিবেই সর্বকাল জুড়িয়া তাহা করিয়া আসিতেছে- বুক দিয়া দোকানটি আগলাইয়া রাখিয়া মামীকে উপেন বলিল ‘ছেলেমেয়ে লইয়া আমি পথে বসিতে পারিব না আপনি যাহা পারেন করিয়া লন’। উত্তরে উপেনের মামী যাহা করিল তাহা অনুমান করাও সুকঠিন নহে। তিনি প্রবলের দরজায় ধর্না দিলেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের কাছে নালিশ করিলেন। জমিদার উপেনকে কহিলেন ‘জমিখানা তোমাকে ছাড়িতে হইবে বাপু’ উপেন অনেক অনুনয় করিল গরিবের প্রতি দয়া করিতে। কিন্তু গরিবের গরিবিয়ানায় জমিদারের মন গলানোর চেষ্টা অরণ্যে রোদন মাত্র। উপেন মামীকে ধরিয়া শেষ চেষ্টা করিল,বলিল ‘অন্তত আমাকে কিছু পুঁজি দাও যাহা দিয়া নতুন কিছু শুরু করিতে পারি।’তবে মামী নাকি মনে মনে তুষের আগুনে

জ্বলিতেছিলেন, দুর্যোধনের মত বিনা যুদ্ধে এক বিন্দু জায়গা ছাড়িবেন না বলিয়া হুঙ্কার দিলেন,বিশেষত দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার যেখানে তাহার সেনাপতি!গরিবের নাকি ভগবান আছে! হায়! দুর্জনে বলে উপেনের মামী জমিদার এবং তার বিশেষ পারিষদগণকে লক্ষাধিক টাকা খাওয়াইয়া হাতে করিয়াছিল,জমিদারের ছোট মেয়ের বিয়েতে পক্ষীবিশেষের মাংসের সম্পূর্ণ খরচ বহন করিতে রাজি হইয়াছিলেন।

একদিন প্রাতে জমিদার তাহার পারিষদবর্গকে লইয়া প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ডাক্তার বলে তাহার মত প্রেশারের রুগীর জন্য ভোরের হাওয়া বড়ই উপকারী! মনোরম পরিবেশে তাহার মনখানা সত্যই জুড়াইয়া আসিতেছিল। পারিষদবর্গকে ভোরের হাওয়ায় উপযোগিতা বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন অকস্মাৎ উপেনের মুদির দোকানখানি তাহার চক্ষুশূলের কারণ হইল। গরিব ব্যাটা জমিদারের মনোরম পরিবেশ নষ্ট করিতেছে এটা কাহারও সহ্য হইলো না। পার্ষদবর্গ উদ্যোগী হইয়া বাহিরের অন্য একটি দোকান হইতে একটা তালা কিনিয়া আনিয়া মুদির দোকানের সাটার ফেলিয়া তালা ঝুলাইয়া দিল। সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে লোকে প্রথমে বাকবিতণ্ডা করিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করে, কিন্তু পার্ষদবর্গ কিনা জমিদারের মেয়ের বিয়েতে পক্ষীবিশেষের মাংস উদরপূর্তি করিয়াই ভোজন করিয়াছিল তাই নুনের দাম মিটাইতে বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই! উপেন ও তাহার বৃদ্ধ পিতা হতবাক হইয়া দোকানের ভিতরে বসিয়া রহিলেন। দমবন্ধ হইয়া মরিয়া যাইবার বোধটুকু হয়ত তখনও তাহাদের ফিরিয়া আসে নাই। আর জমিদারেরও এই ভয় ছিল না তাই অবলীলাক্রমে দোকানখান বন্ধ করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। বোধ করি বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমিদার জানিতেন গরিবের প্রাণ সহজে বাহির হয় না!! ঘণ্টাখানেক পর বাহিরের দোকান হইতে পারিষদবর্গকে লইয়া চা ও প্রাতঃরাশ সারিয়া আসিয়া যখন দোকানের পাশ দিতে বাটী ফিরিতেছিলেন তখন খেয়াল হইল উপেনের কথা। পারিষদকে দিয়া সাটারখানি তুলাইয়া উপেনকে ধমকাইয়া দিলেন দোকান ছাড়িয়া দিবার জন্য।

তারপরের ঘটনা স্বাভাবিক গরিবের ভগবান প্রবলের জমিদারের কাছে হার মানিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন উপেন যথারীতি দোকান গুটাইয়া লইল। তাহার যাহা যাহা মুদির বাকি পাওনা ছিল তাহা উদ্ধার

করিল। কিছু পাইল কিছু হারাইল, এ প্রসঙ্গে বলিতে ভুলিয়াছি মামীর কাছে উপেনের হাজার বিশেক টাকার মুদির বাকি ছিল, কিন্তু যেহেতু জমিদার ও তার পার্ষদদের সন্তুষ্ট করিতে তাহার প্রচুর টাকা বাহির হইয়া গিয়াছিল তাই উপেনের বাকির খাতাখানি তাহারই সম্মুখে ছিঁড়িয়া তিনি বাকি পরিশোধ করিলেন! গরিবের ভগবান এইবারও মুখ বুজিয়া দেখিলেন! পরের কথা আর বিশেষ কিছু নাই, তবে এবারের উপেন আগেরবারের মত বিবাগী হইয়া পালাই নাই। বোধ করি সংসারের মুখ চাহিয়া! স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিল, নিজের যাহা আছে সকলই বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা জোগাড় করিল। তারপর একটি জায়গা কিনিয়া নিজের মুদির দোকান খুলিল। মাঝে মাঝে মনুষ্যের মধ্যে আমি মানবতা দেখিয়াছি, পাড়ার বাকি দোকানিদিগকে আমি দেখিয়াছি উপেনকে বাকিতে মুদির জিনিস দিতে পাইকারী মূল্যে, কারণ দোকান পুনরায় স্থাপন করিলেও দোকানে জিনিস কিনিয়া আনার সামর্থ্য উপেনের ছিল না। বাকির মাল নিজের দোকানে বিক্রয় করিয়া সে দোকানিদিগকে টাকা ফেরত দিত।

গল্পের জমিদার বাবু আমার ওয়ার্ডের কমিশনার। চোদ্দ বছর ধরে অপরাজিত আছেন। এই ওয়ার্ডের প্রতি তাঁর এতই ভরসা যে তিনি এখন আর এখানে প্রতিযোগিতা করে নিজের সময় নষ্ট করেন না। তিনি নিজের স্ত্রীকে তাঁর স্থলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং নিজে অন্য ওয়ার্ডের হয়ে লড়েন। আগেরবার তো শুনেছিলাম তিনি সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় ভোটে দাঁড়িয়ে সেখানকার অবিসংবাদিত নেতার কাছে মাত্র পাঁচ ভোটে হেরেছিলেন!! মামী আর তাঁর ছেলেমেয়ের আসল পরিচয় আর বললাম না ঘৃণায়। আর উপেন উপেনই থাক, তার দুর্ভাগ্য তারই থাক তাকে সত্যপ্রকাশের অছিলায় আর আঘাত না-ই বা করলাম।

সম্পুর্ণ অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বলি সেদিন বন্ধুদের মেসে গিয়েছিলাম প্রোজেক্টের কাজ করতে। কাজ করার পর খেয়ে দেয়ে 'তামাকবিশেষ' সেবনের পর আমরা ঠিক করলাম একটা মুভি দেখবো। সাধরণত 'pink floyd' 'poets of the fall' 'guns and roses' 'coldpaly' 'breaking benjamin' এই সবই শুনি আমরা। কিন্তু সেদিন কেন জানি না মনে হল মুভি দেখবো!!নানা জনে নানা মুভি দেখবে বলছে 'pursuit of the happiness' 'perks of being a

wallflower' 'kingdom of heaven' আরো কত কি!! আমি বললাম 'dark knight rises' দেখবো। আমার কথাটাই রইলো শেষমেশ। কি অসাধারন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেদিন আজ বুঝতে পারি অভিনয়ের ওই রূপটা না দেখা থেকে যেত যদি আমরা যেদিন ওটা না দেখতাম। কাকে ছেড়ে কাকে দেখবো! কথা তো বলছে না যেন আবৃত্তি করছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের তালে তালে। দেখতে দেখতে সেই সিনটা এল যেখানে Bruce Wayne কে Bane কুপের মধ্যে ফেলে দিল তখনকার কথাগুলো তুলে দিলাম

Why didn't you just...

...kill me?

BANE:

You don't fear death, you welcome it.

Your punishment must be more severe.

Torture?

Yes.

But not of your body.

Of your soul.

Where am l?

BANE:

Home.

Where l learned the truth about despair.

As will you.

There is a reason why this prison

is the worst hell on earth:

Hope.

Every man who has rotted here

over the centuries...

...has looked up to the light

and imagined climbing to freedom.

So easy.

So simple.

And like shipwrecked men turning

to seawater from uncontrollable thirst...

...many have died trying.

l learned here there can be

no true despair without hope.

So as l terrorize Gotham...

...l will feed its people hope

to poison their souls.

l will let them believe

that they can survive...

...so that you can watch them clambering

over each other to stay in the sun.

You can watch me torture an entire city.

And then when you have truly understood

the depth of your failure...

...we will fulfill Ra's Al Ghul's destiny.

We will destroy Gotham.

And then, when it is done...

...and Gotham is...

...ashes...

...then you have my permission to die.

আমার কেন জানি না নিজেকে মুভির সেই কূপের মধ্যে আটকা পড়ে আছি বলে বোধ হচ্ছিল। সবই দেখছি সবই জানি কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা নেই। সংবাদপত্রে যদি একটাও জুয়াচুরির ঘটনা না থাকে তো কেমন জোলো মনে হয়। There is a reason why this prison is the worst hell on earth: Hope.

Every man who has rotted here over the centuries.....has looked up to the light and imagined climbing to freedom. So easy. So simple. And like shipwrecked men turning to seawater from uncontrollable thirst...

হাত পা বাঁধা সব কিছু দেখেও চোখ বুজে থাকতে হয়। মুখ খুললেই প্রাণের ভয়! এ কোন সমাজে বাস করছি আমরা! বাংলার এই রূপ দেখে কি জীবনানন্দ লিখতে পারতেন 'আবার আসিব ফিরে

ধানসিঁড়ির তীরে...এই বাংলায়'!! পার্টিতে পার্টিতে মারামারি খুনোখুনি গ্রামাঞ্চলে হয়, সবার সমঝোতা হয়েছে এখন বৃহত্তর কলকাতায় সবাই গলা মিলিয়ে কোরাস গাইছে-

'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কি শর্তে'!

বামই আসুক বা ডান, আমার প্রশ্ন একটাই আমরা কি কোনদিন শান্তিতে বাঁচতে পারবো না??? চিরদিন এইভাবে অবিচার সহ্য করে যেতে হবে??? স্বাধীনদেশে নাগরিক হিসেবে আমার একটাই প্রশ্ন—কেন ভোট দিতে যাব?? কার জন্য ভোট দিতে যাব??

পিতৃরূপেণ

পরিচয়

কর্মসূত্রে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল ছেলেটি। কয়েকটা বাড়ি পরেই আমার আস্তানা। সেই সুবাদেই আলাপ। বয়সে অনেকটা ছোট হলেও আলাপ জমে ওঠার কয়েকদিন পর এক বিকেলে দেবাঞ্জন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল দেবারতির সঙ্গে। ওর প্রেমিকা। সেও আমাদের দুজনের মত একই কারণে গৃহত্যাগী। থাকে লেডিস হোস্টেলে। সবার মা-বাবা দেশের বাড়িতে।

বিবাহে নিমন্ত্রণ ছিল দু'পক্ষ থেকেই। ফলে কনেযাত্রী বা বরযাত্রী কারও দিকেই ঠাঁই নিইনি। জিজ্ঞাসা করাতে উভয়েই আলাদা করে বলেছিল 'তুমি কিন্তু আমাদের দিকে'। কাউকেই খুশি না করে নিজের মত চলেছিলাম। বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর দুজনে আমার কাছেই জানতে চেয়েছিল কম খরচে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে কোথায় যাওয়া যায়। বলেছিলাম অধুনা বিখ্যাত হওয়া তৎকালীন একেবারেই অখ্যাত 'মন্দারমনি'। কলকাতা শহরের কোথায় গিয়ে হোটেলের জন্য কথা বলতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলাম। ঘুরে আসার পর উচ্ছ্বসিত দুজনেই। দেবারতি অবিশ্যি কপট রাগ দেখিয়ে বলেছিল 'কি একটা জায়গা বললে, কেনাকাটার কিছু নেই, হোটেলের বাইরে খাওয়ার জায়গা নেই, বিয়ের পর প্রথম একসঙ্গে দু'জনে বেড়াতে গেলাম আর কারও জন্যে কিছু আনতে পারলাম না'। উত্তর দিয়েছিলাম 'আমায় যদি বলতে তোমরা কেনাকাটা করতে বা খেতে যাচ্ছ তাহলে অন্য কোনও জায়গা বলতাম।'

-'তাহলে সেটাও জেনে রাখি, পরে কাজে লাগতে পারে'

-'ধর্মতলা'।

এই রকমই হাসিঠাট্টায় শেষ হয়েছিল সেদিনের কথোপকথন। তারপর সময় করে একদিন ডাকলাম দুজনকেই। উদ্দেশ্য বিয়েতে যা খাইয়েছিল তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করা। এসেছিল। এরপর দিন কেটে গেল অনেকটাই। মাঝে মাঝে পাড়াতে, কখনও বাজারে দেখা হয়, সবসময় একসঙ্গে না হলেও, আলাদা আলাদা ভাবে দু'জনের সাথেই। কোনও কোনও দিন ওরা আসে আমার বাড়িতে, কখনও আমার পদধূলি পড়ে ওদের ফ্ল্যাটে। এভাবেই চলছিল। একদিন হঠাৎ

ডাক এল সাগরপার থেকে। অনিচ্ছেতে দেশান্তরী হতে হল। দীর্ঘ প্রায় বছর দুয়েক। ই-মেলে যোগাযোগ করি, যখন সময় হয়। তবু দূরত্বের কারণে অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। ফেরার যখন প্রায় সময় হয়েছে, দিন সাতেক বাকি, তখন আকস্মিক ভাবে এক বার্তা পেলাম দেবাঞ্জনের।

- 'তোমার তো বোধহয় ফেরার সময় হয়েছে। কবে ফিরছ? বিশেষ দরকার আছে। দেখা করা খুব জরুরি'। ক্ষণ জানালাম।

ফিরে এসেই ফোন করলাম। এক ছুটির দিন বিকেলে দরজা খুলেই দেখতে পেলাম পরিচিত মুখ দুটি বেশ খানিকটা বদলে গেছে। প্রথমে হাতে তুলে দিলাম ওদের জন্য নিয়ে আসা কিছু উপহার। তাতেও মুখের ভাব বিশেষ বদলালো না। দু'জনের মুখ থেকেই বের হল শুকনো ধন্যবাদ। এমনকি খুলেও দেখল না কি আছে ভেতরে। অবাক হলাম বেশ। তবু তিন কাপ চা আর কিছু কুকিজ নিয়ে বারান্দায় বসলাম। 'কেমন আছ তোমরা?' চায়ে চুমুক দিয়ে কথা শুরু করলাম আমি - 'কি খুব বিশেষ দরকার লিখেছিলে?'

'আসলে...' দেবাঞ্জনকে থামিয়ে দিল ওর সহধর্মিনী। 'আমি বলি' দেবারতি আমার মুখের দিকে তাকাল। সম্মতি জানালাম।

-'আমার পক্ষে মা হওয়া সম্ভব নয়।'

ধাক্কাটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম –'কেন? কি হয়েছে'

'আসলে সমস্যাটা আমারই' উত্তর এল দেবাঞ্জনের থেকে 'ছেলেবেলায় একবার মাম্পস হয়েছিল। ডাক্তারের বক্তব্য সমস্যা ওখান থেকেই শুরু'।

'কিন্তু আজকাল তো নানারকম উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি বেরিয়ে গেছে'...

'সত্যি কথা বলতে কি গত এক বছরে আমরা মোটামুটি পণ্ডিত হয়ে গেছি এই ব্যাপারে'- আবার সেই চেনা হাসিটা দেখতে পেলাম দু'জনের মুখেই - 'এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দত্তক নেব'।

ভালো লাগল কথাটা শুনে। একে অন্যকে দোষারোপ না করে সরাসরি বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন করলাম –'তোমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত তো?' দ্বৈতকণ্ঠে সম্মতি এল।

-'খালি তোমার একটা সাহায্য চাই'

-যথা সম্ভব সদা প্রস্তুত

-তোমাকে আমাদের রেফারি হতে হবে

-সেটা কি?

-তোমার তো লেটারহেড আছে। তাতে তোমার পেশা, ঠিকানা, ফোন নম্বর সব আছে। তোমাকে খালি লিখে দিতে হবে তুমি আমাদের চেনো। তাহলেই হবে। আসলে এইরকম তিনজন লাগবে। আর বোঝো তো, সবাইকে তো বলা যায় না, এমনকি ঘনিষ্ঠ সব আত্মীয়-স্বজনকেও বলিনি। আমাদের মা-বাবার বাইরে জানে শুধু ওর এক জ্যাঠতুতো দাদা, আমার দিদি, ওরা গ্যারেন্টর, আর তোমার মত বাকি দু'জন। সব কিছু হয়ে গেলে তো বলবই।

উঠে একটা লেটারহেড ছিঁড়ে নিয়ে দেবাঞ্জনের হাতে দিলাম - 'লিখে দিও। তারপর না হয় দস্তখত করে দেব'। আপত্তি ছিল দু'জনেরই। আমাকেই লিখতে হবে। আমাকে টলাতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল। পরেরদিন সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ঢোকার আগে সই করে চা খেয়ে ফিরলাম। ঠিক চার দিন বাদে আবার ফোন। এবার দেবারতি।

-'আরেকটা সাহায্য চাই। আজ কাগজপত্র সব জমা করেছি। ওরা হোম স্টাডিতে আসবে পনের দিন পরে। আমাদের দু'পক্ষের বাবা-মা, গ্যারেন্টরসহ আরও কয়েকজন থাকলে ভালো হয়।তুমি কি পারবে?' এবারও সম্মতি জানালাম।

নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই উপস্থিত হলাম। কর্তা বেরিয়ে গেছে ওনাদের নিয়ে আসতে। কর্ত্রীর আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি বরাবরের মত এবারও খুঁজে পেলাম না। খানিকক্ষণ পরেই ফিরল দেবাঞ্জন। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা। বৈঠকখানাতে বসলাম আমরা। খালি বাদ হবু পিতা-মাতা। কথা হল। উনি আসলে বুঝতে চাইলেন নবাগত বা নবাগতাকে বরণ করে নিতে

আমরা কতটা প্রস্তুত। এরপর আমি শুভক্ষণটি জানতে চাইলাম। ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে জানালেন সময় হলেই জানতে পারব। এরপর আলাদা আলাদা ভাবে মূল পাত্র-পাত্রীর সাথে কথা বলে বেরিয়ে গেলেন। আমিও ফিরে এলাম।

নানা কাজের চাপে মনে পড়লেও ঠিকঠাক ভাবে খবর নেওয়া হয়না কতদূর কি এগোল। একদিন ফোন ঘেঁটে দেবাঞ্জনকে ফোন করতে যাব ঠিক সেই সময়েই বেজে উঠল। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। উল্টো দিকে একটা ভীষণ উল্লসিত কণ্ঠ - 'ফোন করেছিল, কালকেই সকালবেলা ডেকে পাঠিয়েছে'। ভালো ভাবে কিছু জানতে চাইবার আগেই লাইন কেটে গেল। কয়েকবার চেষ্টা করলাম। প্রত্যেকবারই ব্যস্ত। ফোন এল পরেরদিন বিকেলে। দেবারতি কলিং।

-'জানো, আজ আমাদের বাচ্চা দেখিয়েছে। মেয়ে। কি ফুটফুটে। হাতে নিয়েছিলাম। কাল যেতে হবে ল-ইয়ারের কাছে। লিগাল পেপার সই করে দিয়ে আসতে হবে। পরশু সকালে নিয়ে আসব। আর হ্যাঁ, আবোল তাবোল লেখ তো খুব, একটা সুন্দর নাম ভেবে রেখো, রাতে জেনে নেব। ল-ইয়ারকে কাল বলতে হবে।'

বলা বাহুল্য এই কঠিন কাজটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু কয়েকটা নাম ভেবে লিখে রাখলাম। রাতে ফোন এলে জানিয়ে দিলাম। পরের দিন আমি ফোন করলাম। জানলাম সকাল পাঁচটায় হাজির হতে হবে হবু বাবা-মাকে। প্রার্থনা হবে, তারপরেই বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফেরা। সেই সঙ্গে এটাও জানলাম আমার দেওয়া নামগুলোর একটা থেকেই বাচ্চার নামকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙল প্রায় চারটে। ইচ্ছে ছিল ওদের শুভক্ষণের সাক্ষী থাকব। কিন্তু চমক হিসেবে। জানালা দিয়ে দেখলাম দেবাঞ্জন আর দেবারতি বেরিয়ে গেল। সাড়ে চারটে নাগাদ আমি বের হলাম আমার গাড়িতে। অকুস্থলে পৌঁছতে সময় লাগল মাত্র আধ ঘণ্টা। অপেক্ষা করতে হবে একতলায়। প্রার্থনাকক্ষ দোতলায়। বসলাম চেয়ারে। প্রার্থনা শেষ হল প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ। নেমে এল দুজনেই। দেবারতির কোলে শিশুকন্যা ঘুমে অচেতন। দুজনকেই বেশ খুশি দেখে ভাল লাগল। এতক্ষণে বুঝলাম আরও অনেকেই আমার মত রবাহুত। সেই সঙ্গে এও বুঝলাম একমাত্র আমার হাত খালি। ওদের দিদিরা বলেই মনে হল। সবাই চলে গেল দেবারতির কাছে।

খালি হাতে এগোতে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। এমন সময় খানিকটা আকস্মিক ভাবেই চোখাচোখি হল দেবাঙ্গনের সাথে। ডাকল না আমায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। বলতে চেয়েছিল 'তুমি এসেছ? একবারও তো.....' অসম্পূর্ণ রয়ে গেল কথা। জড়িয়ে ধরল আমায়। অস্ফুটে খালি বলতে পারল – 'প্লিজ ব্লেস হার অ্যান্ড প্রে ফর হার।' অনুভব করলাম আমার কাঁধের কাছে শার্ট ধীরে ধীরে ভিজে উঠছে।

বিবর্তন ও বৃদ্ধাশ্রম

প্রত্যয়দীপ্ত রুদ্র

বৃদ্ধাশ্রম কথাটা শুনলেই মনে পড়ে যায় নচিকেতার সেই আবেগপ্রবণ গান – "আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম"। সম্প্রতি একজন আমেরিকান বন্ধু আমার মুখে ভারতীয়দের বাবা-মার সঙ্গে একসাথে থাকার কথা শুনে যারপরনাই বিস্মিত হল। বললে এ আবার কি ধরনের অদ্ভুত নিয়ম! ওদিকে ভারতবর্ষে দিনদিন বেড়ে চলছে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা। এদিক ওদিক গজিয়ে উঠছে বুড়োদের স্টোর করার গুদামঘর। সেখানে বাপ-মা কে ডাম্প করে দিয়ে মুক্ত সন্তানরা হাসিমুখে বাড়ি ফিরে আসছে। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সবাই যে এসব জায়গায় চরম অসুখী আছেন ছবিটা ঠিক সেরকমও নয়, তবে কে না চায় নিজের ছেলে মেয়ের কাছে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাতে। তাই ফেসবুকে বেড়ে চলে সেন্টিমেন্টাল পোস্ট, বুড়ো বাবা মায়ের দুঃখের কাহিনী। অথচ যখন দেখলাম আমার অতি পরিচিত একজন ভদ্রলোক নিজের কেরিয়ারের খাতিরে বৃদ্ধা মা-কে একটি বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এলেন তখন ভেবে দেখলাম ব্যাপারটা যতটা নৃশংস মনে হয়, ততটাও কিন্তু আসলে নয়। হয় তাঁকে স্বার্থত্যাগ করে নিজের কেরিয়ার বিসর্জন দিতে হবে, অথবা তাঁর মা-কে স্বার্থত্যাগ করে বাকি জীবন এরকম একটা আশ্রমে কাটাতে হবে। প্রশ্নটা হল কে স্বার্থত্যাগটা করবেন। ইমোশন বা সেন্টিমেন্টকে দূরে সরিয়ে যদি ভাবা হয়, তাহলে কিন্তু দ্বিতীয়টাই বেশি যৌক্তিক মনে হয়। ছেলেটির সামনে পড়ে আছে লম্বা জীবন, তার পক্ষে জীবিকার ব্যাপারে স্বার্থত্যাগ করার চেয়ে বৃদ্ধা মায়ের স্বার্থত্যাগটা বস্তুবাদের দিক থেকে অনেক বেশি যৌক্তিক। তাঁর জীবনে হয়ত আর বেশিদিন বাকি নেই। তাঁর দিক থেকে ছেলের সাথে থাকাটা পুরোপুরি একটা সেন্টিমেন্টাল ইস্যু, আর কিছু নয়। অবশ্যই এ যুক্তি মানতে গেলে প্রথমেই এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন সেই বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হয়। এটা সবসময় হয়ে ওঠে না, সত্যি কথা; আবার এটাও সত্যি যে অনেক ভাল ভাল বৃদ্ধাশ্রমে এত সুন্দর বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁদের দেখভাল করা হয় যে নিজের সন্তানও তত ভাল করতে পারতনা। যাই হোক, সেই তর্কে না ঢুকে দেখা যাক স্রেফ ওই সেন্টিমেন্টাল ইস্যুটা কতটা গ্রহণযোগ্য। আপনি বলবেন মা কেন স্বার্থত্যাগ করবেন? তিনি তো সন্তানের জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ ইতিমধ্যেই করেছেন, তাকে জন্ম দেওয়া থেকে শুরু করে বড়

করে তোলা, সবটার মধ্যে তাঁর অজস্র স্বার্থত্যাগ লুকিয়ে রয়েছে পদে পদে। আমি বলব সন্তানের প্রতি মা বাবার স্নেহ ভালবাসা অনেক বেশি জৈবিক, সমস্ত সেন্টিমেন্টকে দূরে সরিয়ে দিলেও বাবা মা সন্তানের যত্ন নেবেন, স্রেফ নিজের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। এই যুক্তি বাবা-মায়ের সেবা করার ক্ষেত্রে খাটেনা। বরং বিপরীত যুক্তিটাই খাটে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের, দেশের এবং প্রজাতির নজরে বোঝা। মর‍্যালিটির খাতিরে এবং ইমোশনাল কারণে মানুষ তাঁদের সেরকমভাবে দেখেনা। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতির কথা ভাবুন যেখানে আপনি এবং আপনার মা-বাবা এঁদের মধ্যে একজনকে মরতে হবে। তখন জৈবিক দিক থেকে ভাবলে আপনার বাঁচাটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে কি? কি করবেন বলুন, বিবর্তন ব্যাপারটাই যে নিষ্ঠুর। ডারউইনের থিওরির মূল কথাই যে "জোর যার মুলুক তার"। মানুষ সমাজবদ্ধভাবে যেভাবে বাস করে তা দেখে একনজরে মনে হতে পারে মানুষ নামক প্রজাতিটি "জোর যার মুলুক তার" নীতির বিরোধী, কিন্তু ভাল করে ভাবলে দেখা যাবে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। মানুষের মধ্যে অন্যকে ভালবাসা, সাহায্য করা, সমাজবদ্ধ ভাবে থাকা, এই ধরনের গুণগুলো এল কিভাবে? বুদ্ধিমান মানুষ বুঝেছিল যে একসাথে থাকলে, একে অপরকে সাহায্য করলে প্রত্যেকেরই সুবিধে। একা একা থাকলে প্রজাতি হিসেবে তার টিকে থাকার সম্ভাবনা যতটা, একে অপরকে সাহায্য করলে সেই সম্ভাবনা অনেক বেশি। নিজেই ভেবে দেখুন না, আপনাকে একাই চাষবাস, শিকার থেকে শুরু করে নিজের সব কাজ একা হাতে করতে হচ্ছে। এইভাবে দিন গুজরান করতে হলে দুদিনে প্যান্টুল হলুদ হয়ে যাবে, দুমাস পর চেহারা ভেঙে আদ্ধেক হয়ে যাবে আর দু'বছর পর আপনি টেঁসে যাবেন। সেকথা উপলব্ধি করেই একসঙ্গে থাকা, অপরকে সাহায্য করা এবং সর্বোপরি মর‍্যালিটি নামক জিনিসটির আমদানি। এই যে আপনি আপনার ছোট্ট বাচ্চাটিকে শেখাচ্ছেন অন্যের ক্ষতি করতে নেই, এটা খারাপ কাজ ইত্যাদি, বা এই যে বিদ্যাসাগর মশাই লিখছেন "গোপাল অতি সুবোধ বালক", এই সব কিছুর উৎস কিন্তু ওই নিজের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার প্রেরণা। অন্যের ক্ষতি করতে গেলে সে-ও আমার ক্ষতি করতে পারে, তাই সবাই মিলে একটা আপোসে আসা – কেউ কারো ক্ষতি করবনা, সহযোগিতা করে চলব। বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া যেমন একটি

জৈবিক ঘটনা, যৌন মিলনের মাধ্যমে সন্তান পয়দা করে নিজের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে, ঠিক সেরকমই সমস্ত মর‍্যালিটিরও উৎস ওই বিবর্তনবাদের মূল কথাটি।

তবে ব্যাপারটা যতটা সহজে বলে ফেললাম ততটাও সহজ বোধহয় নয়। আসুন আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক। মানুষ নামক জন্তুটি বড়ই জটিল, আরেকটু সহজ উদাহরণ নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। না-মানুষ জগতে (কার্টসি – নারায়ণ সান্যাল) সন্তানস্নেহ জিনিসটা যে প্রভূত পরিমাণে বর্তমান সে নিয়ে সংশয় নেই। উদাহরণ ভুরি ভুরি। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দেখভাল করার নজির বিরল। বেশিরভাগ জীবজন্তুর ক্ষেত্রেই সন্তান বড় হওয়া মাত্র সে বাবা-মা কে ছেড়ে চলে যায়, নিজের সংসার পাতে। তারপর না তার বাবা-মা তার খেয়াল রাখে, না উল্টোটা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরে বাবা-মায়ের সাথে দেখা পর্যন্ত হয়না। কিছু কিছু না-মানুষ সমাজে ছেলেরা বড় হয়ে চলে যায়, কিন্তু মেয়েরা আগের প্রজন্মের সঙ্গে একসাথেই বাস করে। যেমনটা হয়ে থাকে হাতি বা সিংহের ক্ষেত্রে। মেয়েরা একসঙ্গে বাস করে, বিভিন্ন প্রজন্ম মিলে মিশে, একে অপরকে সাহায্য করে নানাভাবে। এও দেখা যায় যে একটি বাচ্চা সিংহী তার মাকে সাহায্য করছে মায়ের পরবর্তী বাচ্চাদের বড় করে তোলার কাজে। কিন্তু এই সাহায্য করা ইত্যাদি পুরোটারই মূল লক্ষ্য পরবর্তী প্রজন্মকে দুধেভাতে বড় করে তোলা। মা কষ্ট করে সন্তানকে বড় করেছে বলে অথর্ব মায়ের সেবা করে প্রতিদান দেওয়ার জন্য নয়। বরং মা অথর্ব হয়ে পড়লে নিজেই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বানপ্রস্থে গিয়ে মৃত্যুর দিন গোনে। অথর্ব মাকে খাবার শিকার করে এনে দিচ্ছে সন্তান, এরকমটা সচরাচর দেখা যায়না।

ওদের সমাজে সমস্ত মনোনিবেশ যেন পরের প্রজন্মকে সার্থকভাবে বড় করে তোলাতে। সমাজবদ্ধ জীবরা বড় হয়ে একসাথে বাঁচে, একে অপরকে সাহায্য করে, উদাহরণস্বরূপ মৌমাছির কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ অথর্বদের টিকিয়ে রাখার প্রতি বিশেষ নজর কোথাওই নেই। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর মনে হতে পারে, কিন্তু এই বিবর্তনের নিয়ম।

এরকম নজিরও আছে যেখানে সদ্যজাত সন্তান মায়ের মাংস খেয়ে বড় হয়। এই ধরনের প্রাণীদের বলা হয় Matriphagous। এরকম একটি প্রাণী হল Stagodyphus lineatus নামক মাকড়সা। বাচ্চা মাকড়সারা মা-কে মেরে খেয়ে ফেলছে, ব্যাপারটা শুনতে যতই খারাপ লাগুক, ওদের কাছে

নিজের প্রজাতির টিকে থাকার এই পদ্ধতিটাই গ্রহণযোগ্য। প্রসঙ্গত বলি, অনেক প্রজাতির মাকড়সা শিশুই কিন্তু বাপের মুখ দেখতে পায়না, কারণ মা মাকড়সা সেই বাপটিকে আত্মসাৎ করে। ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার প্রজাতির মেয়ে মাকড়সারা যেমন যৌন মিলনের পর গর্ভে সন্তান এসছে বুঝতে পারলেই প্রেমিকটিকে মেরে খেয়ে ফেলে, এতে ওদের ডিম পাড়ার এবং সেই ডিমকে পুষ্টি যোগানোর কাজটা ভাল হয়। প্রেম ভালবাসা নিয়ে আদিখ্যেতা ওদের নেই।

সত্যি কথা বলতে যে মাতৃস্নেহ নিয়ে আমরা এত আহা উহু করি সেটা যে কতটা বিবর্তনের তাগিদে তা কয়েকটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। Burying beetle এর মা-রা তার অসংখ্য বাচ্চাদের জন্য খাবার এনে খাওয়াতে থাকে, যতক্ষণ না খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেই সংগৃহীত খাবার শেষ হয়ে যায়, তখন যেসব সন্তান অভুক্ত রয়ে গেছে তাদেরকে মা বিটল স্রেফ খেয়ে ফেলে। কারণ বাকি সন্তানদের জন্য আবার খাদ্য সংগ্রহ করার শক্তি তো চাই। ঠিক একই রকমভাবে মা Hamster–রা খেয়ে ফেলে তাদের বাড়তি সন্তানদের। হয়তো ভাবছেন এত এত সন্তানের জন্ম দেওয়ার দরকার কি যদি সবাইকে খাওয়াতেই না পারবে? আসলে ওরা ঝুঁকি নিতে চায়না, অনেক সময় নানা কারণে অনেক সন্তান দুর্বল হয়ে জন্ম নেয় বা জন্মের পর মারা যায়। তাই বেশি করে সন্তান জন্ম দিয়ে দুর্বলগুলিকে খেয়ে নেওয়াই ওদের স্ট্র্যাটেজি। Long tailed skink জাতের গিরগিটিদের অভ্যেস একটু অন্যরকম। ডিম পাড়ার পর যদি ওরা দেখে যে আশেপাশে প্রচুর শত্রু প্রজাতির প্রাণী ডিম খাবার লোভে ঘুরঘুর করছে, তখন ওরা নিজেরাই নিজের ডিমগুলো খেয়ে ফেলে। ডিমগুলো যখন যাবেই তখন আমার পেটেই যাক, অন্যের পেটে যায় কেন? – ভাবখানা এরকম। শুনতে আপনার যতই অদ্ভুত লাগুক যুক্তিতে কিন্তু ভুল নেই, ওই ডিম থেকে নিজে পুষ্টি লাভ করে সে আবার পরের ডিম পাড়ার জন্য আদা জল খেয়ে লাগতে পারবে। Black eagle মা-দের মধ্যে দেখা যায় আরেক মজার ঘটনা। ওদের সন্তানরা ছোট্ট অবস্থায় ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে ফেলে, কিন্তু মা ঈগল নিরাসক্তভাবে দেখে কেবল। ও জানে এই মারপিট করে যারা টিকে থাকবে তারাই সবচেয়ে শক্তিশালী বাচ্চা। ওর লক্ষ্য তো ওটাই, শক্তিশালী বাচ্চাগুলোকে বেছে নিয়ে তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য ফুল এফর্ট দেওয়া। মোদ্দা কথা সেই সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট।

এই সমস্ত কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হয়ত হাজার হাজার বছর ধরে একেকটা গোটা প্রজাতি এরকমটা করে আসছে। যদি এগুলো ওদের নিজ প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার সহায়ক না হত তাহলে এই অভ্যাসে অভ্যস্ত প্রাণীরা হারিয়ে যেত বিবর্তনের সর্পিল পথে। হয়ত এরকমই হারিয়ে গেছে অনেক প্রাণী যারা সন্তানদের দিকে বেশি মনোযোগ না দিয়ে বুড়ো বাপ-মায়ের সেবায় প্রাণপাত করত। কে বলতে পারে এরকম হয়েছে কিনা?

আমায় ভুল বুঝবেন না। বাপ-মায়ের সাথে থাকা বা বুড়ো বয়েসে তাদের দেখভাল করা খুব খারাপ কাজ এ কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি লিখতে বসিনি। বিনা স্বার্থে অপরের ভাল করা নিঃসন্দেহে খুবই ভাল কাজ। তবে কিনা সে ব্যাপারটা জৈবিক তাগিদে আসেনা। স্বার্থপর জিন আমাদের সবার মধ্যে। তাই মা সন্তানকে যতটা ভালবাসবেন, যতটা স্বার্থত্যাগ করবেন, সন্তান পরে ততটাই করবে এ আশা করা বৃথা। মা-বাবা সন্তানের জন্য কষ্ট করবেন, সেই সন্তান বড় হয়ে আবার তার সন্তানের জন্য কষ্ট করবে এটাই জীবজগতের নিয়ম।

আপনি হয়ত বলবেন জন্তু-জানোয়ারের উদাহরণ দেখিয়ে তুলনা করার মানে হয়না। ওদের মধ্যে মানবিক গুণ নেই, মানুষ ওদের থেকে অনেক সুপিরিয়র। আপনার এ ধারণাও ভুল। মানবিক গুণ বলতে যে সমস্ত ভাল ব্যাপার চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার বেশিরভাগই কিন্তু না-মানুষের মধ্যে পুরো মাত্রায় আছে, কখনও কখনো বেশিই আছে। সে নিয়ে নাহয় আরেকদিন আলোচনা করা যাবে। ইমোশনের বশবর্তী হয়ে কখনও কখনও মানুষ যে চরম স্বার্থত্যাগ করে সেটা কিন্তু একটা প্রজাতির নিরিখে ব্যতিক্রমী ঘটনা। অপরের উপকার করার বেশিরভাগ ঘটনাই আসলে নিজের কোনো না কোনো লাভের কথা মাথায় রেখে। এই নিয়ে হাহুতাশ করার কিছু নেই। জীবন এমনই। মা সন্তানকে মেরে ফেলছে বা সন্তান মায়ের মাংস খেয়ে বড় হচ্ছে এইসব শুনে আপাতভাবে খারাপ লাগলেও আমরা যারা জীবনকে ভালবাসি, ভগবানের বুলি না কপচিয়ে প্রকৃতির অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস করি, প্রকৃতির আশ্চর্য সব সৃষ্টি দেখে অভিভূত হই, তাদের শেষপর্যন্ত এটুকুই মনে হয় – জীবন এমনই।

তবে কি মানুষের মধ্যের সমস্ত সেন্টিমেন্ট, ইমোশন সবই আদিখ্যেতা? কোনো উপকারিতা নেই এগুলোর? তা কিন্তু আমি বলিনি, কেবল এটাই বলতে চেয়েছি যে জৈবিক প্রেরণার লিস্টিতে

ইমোশনের স্থান অনেক পিছনে। মানবসমাজ এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে সে এখনো অ্যাফোর্ড করতে পারে ইমোশনকে। এখনো অন্যের নিঃস্বার্থ উপকার বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখভাল করা তাই নিঃসন্দেহে প্রতিটি মানুষের কাম্য। সত্যি কথা বলতে মনুষ্যসমাজে বাবা-মাও সন্তানের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছুই করে থাকেন। কিন্তু যদি এগুলো অ্যাফোর্ড করার মত অবস্থা না থাকে? যদি মহাপ্লাবনে পৃথিবীর মাটি জলে ডুবতে ডুবতে কয়েকশো কোটি মানুষের জন্য পড়ে থাকে সামান্য একটু জায়গা, সামান্য খাদ্য, পানীয়? তখন? যদি নোয়ার জাহাজের মত (বা ২০১২ ফিল্মের মত) একটি জাহাজে করে তুলে নিতে হয় অল্প কিছু মানুষকে, তখনও কি আপনি ইমোশনের বশবর্তী হবেন?।তারিণীমাঝি যেমন নিজে হাতে তার অতি প্রিয় বৌ-টার গলা টিপে ধরেছিল, সেরকমভাবেই কি ত্যাগ করে যাবেননা নিজের প্রিয়জনদের? বাঁচার তাগিদ বড্ড বড় তাগিদ। জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটাই, বাঁচতে চাওয়ার অদম্য ইচ্ছা...

যে কথা নিয়ে শুরু করেছিলাম তার থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছি। আসল আলোচ্য ছিল বৃদ্ধ বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর যৌক্তিকতা। অবশ্যই তাঁদের সেন্টিমেন্টের কথা ভেবে তাঁদেরকে নিজের কাছে রাখতে পারলে ভাল, কিন্তু যদি উপায় না থাকে? বা যদি এটা করতে গিয়ে প্রভূত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? সেই অবস্থায় ভাল একটা বৃদ্ধাশ্রমে তাঁদের রাখার মধ্যে কোনো অন্যায় আমি দেখিনা। মর‍্যালিটি, ভালবাসা সবেরই সৃষ্টি জৈবিক তাগাদা থেকে। তাই জৈবিক তাগাদার বিপরীতে গিয়ে বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ার মধ্যেও বাহাদুরি কিছু নেই। আসুন আমরা সবাই মিলে বরং এই চেষ্টা করি যেন বৃদ্ধাশ্রমগুলি আরো সুগঠিত, বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে। যাতে প্রয়োজনে প্রিয়জনকে সেখানে পাঠাতে অসুবিধে না হয়। সমস্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সুখে থাকুন, সুস্থ থাকুন, তা সে সন্তান তাঁদের সঙ্গে থাকুক বা না থাকুক।

তথ্যসূত্র – সমস্ত তথ্য ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট থেকে সংগৃহীত - বিশেষত ইংরেজী উইকিপিডিয়া এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এর সাইট থেকে।

পদাবলী গাথার নামাবলী ও চন্ডীদাস

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজকাল ফেসবুক, ওয়েবজিন বা মুদ্রিত পত্র পত্রিকায় দেখবেন কবিতার ছড়াছড়ি। বলা হয়, এমন বাঙালি নেই, যারা কবিতা লেখেনি । পরে, অবশ্য এই সব "দোষ" অধিকাংশেরই কেটে যায়।

বাঙালির রক্তে কবিতা। এমন কি ইদানীং কালের "বং" রাও "পোয়েট্রি" লেখেন, বাংলা আর ইংরেজি মিশেল দিয়ে।

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন:- আগে জ্ঞানীরা বই লিখতেন,আর আম আদমিরা পড়ত, আর এখন আম আদমিরা লেখে, কেউ পড়ে না।

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে সে কথা "বোধহয়" প্রযোজ্য। প্রতি বইমেলায় হাজারে হাজারে কবিতার বই প্রকাশিত হয়, আম আদমিরা কেউ কেনে কি, লেখকের বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া? এরকম কুটিল প্রশ্ন মনে উঁকি দেয় বই কি !!!!

ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে কে না জানে- বিধিই ব্যতিক্রমের নিয়ামক।

তা যাক গে! এই লেখক আদার ব্যাপারী। মানোয়ারি জাহাজের খবর রাখে না। তবে, পড়শিদের ব্যাপারে যেমন আম আদমির কৌতূহল থাকে, আমারও নাকটা সেরকম সব গন্ধ খুঁজে বেড়ায়।

কবিদের এত প্রাদুর্ভাব কেন, পণ্ডিতদের কাছে খোঁজখবর করতে গেলাম। খুলে গেল এক অফুরন্ত ভাণ্ডার ।

চর্য্যাপদ সবচেয়ে পুরোনো বাংলা কাব্য। বৌদ্ধচার্য্যরা ধর্মের বীজ সাহিত্য দিয়ে অঙ্কুরিত করে গিয়েছিলেন। যদিও সে সব গান ছিল, তবুও সেগুলো পদ্য হিসেবেই পড়া যায়।

ধর্মের মাধ্যমেই বাঙালির কাব্য চর্চা। সংস্কৃত ভাষার অং বং চং বুঝতে না পেরে সবাই নিজের মত করে লিখতে আর পড়তে শুরু করলেন।

সংস্কৃত ভাষাটাও আবার খটমট। একটা উদাহরণ দিচ্ছি:-

“জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে ।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ ।।”

(কাব্যদর্শ, ১।২ শ্লোকের টীকা)

এই টীকার মূল বক্তব্য হল, গ্রন্থের আদিতেই প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধের উল্লেখ করা উচিত

এখন এসব ঠ্যালা কে সামলাতে বলুন তো?

আমি গ্রন্থ লিখতে বসি নি, চপলতা বশতঃ এই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছি। শুরু করা যাক।

“বাংলার ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঋকবেদেও বাংলার নাম পাওয়া যায় না। ঋকবেদে ঐতরেয় আরণ্যকে তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়।..... জাতি অর্থে Caste নয়;Ethnic Race।.... এই তিনটি জাতির নাম বঙ্গ,বগধ ও চের। চের-রা যে আসলে দ্রাবিড় জাতির একটি বড় অংশ,সে বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতভেদ নেই।.....” প্রাসঙ্গিকভাবে একটি কথা এখানে বলা দরকার। “খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ হতে ৩০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৯০০ বছর আমরা দ্বিতীয় পর্ব বা যুগ বলে গ্রহণ করতে পারি। এই যুগের সূচনায় ভারতীয় আর্যসমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে এক সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই শ্রুতি,স্মৃতি,পুরাণ এবং মহাকাব্যের মধ্যে দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেছিলেন। কিন্তু এই যুগে রচিত বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে,ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি সমাজে সর্বজনস্বীকৃত ছিল না। ঐতিহাসিকরা মনে করেন,বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রতিবাদই সূচিত হয়েছে এবং এই দুই বর্ণের লোকেই অন্তত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন।”

এবারে, যেটা পাচ্ছি, সেটা হল:- খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সম্রাটদের সময় থেকেই এদেশে আর্যদের বসতি আরম্ভ হয়, আর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার প্রায় সর্বত্র এরা বসবাস আরম্ভ করে।

এদের পোশাকি ভাষা ছিল- সংস্কৃত। শিক্ষা, বিদ্যাচর্চা, সামাজিক ব্যাপারের ভাষাই ছিল সংস্কৃত। আটপৌরে বা ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত থেকে তৈরি প্রাকৃত ।

এরাই প্রথম কয়েক শো বছর যা লিখেছে, সবই সংস্কৃতে। এই সব লেখার নমুনা পাই তামার পাতে লেখা, অনুশাসন বা ভূমি দান পত্রে।

বাংলায় বসে সবচেয়ে পুরোনো কাব্য (মনে করা হয়) "রামচরিত" । রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা এই কাব্যের রচয়িতা ছিলেন – "অভিনন্দ"। অনুমান করা হয়, ইনি পাল বংশীয় রাজা দেবপালের অনুচর ছিলেন ।

পাঞ্জাব থেকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন রাজ্য ধর্মপাল জয় করেছিলেন। ধর্মপাল মারা যাওয়ার পর রাজা হন পুত্র দেবপাল। দেবপাল বাবার সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। হিমালয়ের সানু দেশ হতে আরম্ভ করে বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং উত্তর পশ্চিমে কাম্বোজ থেকে আরম্ভ করে প্রাগজোতিষ পর্যন্ত তার আধিপত্য স্বীকৃত হতো।

এত বড় সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। আরবের বণিক পর্যটক সুলেমান তার বিবরণীতে বলেন-

"বঙ্গরাজ দেবপালের সৈন্যদলে পঞ্চাশ হাজার হাতি ছিল এবং সৈন্যদলের সাজসজ্জা ও পোশাক পরিচ্ছদ ধোওয়া,গুছানো ইত্যাদি কাজের জন্যই দশ থেকে পনের হাজার লোক নিয়োজিত ছিল"।

দেবপালের পরিচয়টা এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হলেও, দিলাম একটাই কারণে, এরা যুদ্ধ বিগ্রহ করলেও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। এই ইতিহাস হলো অষ্টম শতাব্দীর কথা ।

দশম শতাব্দীর শেষ ভাগেও আরও একটা বই লেখা হয়েছিল- সেটার নামও "রামচরিত"।

এতেও, রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে, সম্রাট রামপাল দেবের জীবনী একই সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

নীহাররঞ্জন রায় বলছেন "মধ্যযুগে 'রামচরিত' নামে একটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্যটি রচনা করেন সন্ধ্যাকর নন্দী। সন্ধ্যাকর নন্দীর সময়কাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ

হতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে এই মূল্যবান গ্রন্থটি উদ্ধার করেন। কাব্যটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক;এটি এক অর্থে রামচন্দ্রের কাহিনী,অপর অর্থে পালরাজ রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের ইতি কাহিনী। গ্রন্থের শেষে লিখিত কবি প্রশস্তি হতে জানা যায়,সন্ধ্যাকরের পিতার নাম ছিল প্রজাপতি নন্দী,পিতামহের নাম পিনাক নন্দী এবং জন্মভূমি ছিল পুন্ড্রবর্ধনপুরে। কাব্যটি কবে শুরু হয় ও কবে শেষ হয় এ সম্পর্কে কিছু জানা যায়না।এটির সাহিত্যিক মূল্য স্বল্প কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।কাব্যটিতে ২২০টি শ্লোক রয়েছে। অলংকার প্রিয়তায়,শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অনন্য লক্ষণে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ শতকীয় সংস্কৃত কাব্যের সমগোত্রীয়" (বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব))

চর্যাপদের পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা ভাষার দ্বিতীয় প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ববল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে জনৈক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুঁথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পুঁথির প্রথম দুটি ও শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে জানা যায় নি। কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাসের তিনটি ভণিতা পাওয়া যায় – 'বড়ু চণ্ডীদাস', 'চণ্ডীদাস'ও 'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস'। এর মধ্যে 'বড়ু চণ্ডীদাস'ভণিতা মিলেছে দু'শ আটানব্বইটি স্থানে ও 'চণ্ডীদাস'ভণিতা মিলেছে একশ সাত বার। সাতটি পদে ব্যবহৃত 'অনন্ত'শব্দটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করা হয়। ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মনে করেন,চণ্ডীদাস তাঁর নাম এবং বড়ু প্রকৃত পক্ষে তাঁর কৌলিক উপাধি বাঁড়ুজ্যে বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপভ্রংশ।

আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় প্রাচীন বৈষ্ণব লেখকদের ইঙ্গিত অনুসরণ করে গ্রন্থের নামকরণ করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। অবশ্য পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' লেখা থাকায় অনেকে অনেকে গ্রন্থটিকে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ'নামকরণের পক্ষপাতী।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলী। বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আদি ও শ্রেষ্ঠ রচয়িতা চণ্ডীদাস। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী বাঙালির হৃদয়কে রস মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে চির জাগরূক হয়ে আছে। চণ্ডীদাস একদিকে মন মাতানো পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি অন্যদিকে প্রেমের কিংবদন্তির নায়ক হিসেবে বাঙালির হৃদয়ে চির ভাস্বর। তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চণ্ডীদাস নিয়ে এক সমস্যার উদ্ভব হয়,যা খানিকটা না বললেই নয়।

চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যে এক রহস্যময় অধ্যায়। এ সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করে পণ্ডিতেরা নানাভাবে অনুসন্ধান,বিচার বিশ্লেষণ,যুক্তি উপস্থাপন করেছেন,কিন্তু তাদের পক্ষে এ সমস্যার যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য অকাট্য সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি একজন,দুইজন কিংবা তিনজন চণ্ডীদাসকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা। পদ,ভাষা,ভাব,আঙ্গিক,শব্দ প্রয়োগ,বিষয়,এসব নিয়ে গবেষণা,বিচার বিশ্লেষণ করে পদকর্তাদের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করে পণ্ডিতেরা অন্তত তিন জন চণ্ডীদাসের উল্লেখ করেছেন। আবার কারো কারো মতে চণ্ডীদাস চার জন। অর্থাৎ চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধানের বিষয়টি অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। এমন কি নিশ্চিতভাবে এর সমাধান করার মত যথেষ্ট উপাদানের অভাব এখনও রয়েছে। মধ্যযুগের সুদীর্ঘ পরিসরে আনুমানিক চারশ বছর ধরে চণ্ডীদাস নামধারী কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন। এ সময় কবি যশ প্রার্থী অনেক অখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের ভণিতা প্রয়োগ করে যে বিভ্রান্তির বেড়াজাল তৈরি করেছেন তা চণ্ডী সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। চণ্ডীদাস সমস্যার এই জটিলতার কারণে কেউ কেউ আবার সহজিয়া চণ্ডীদাস নামে একজন চতুর্থ চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে তিনি সহজিয়া মতের রাগাত্মিকা পদের লেখক এবং পিরীতি মন্ত্রের সাধক। এ সম্পর্কে নানা ধরণের গল্প কাহিনিও প্রচলিত রয়েছে। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন,সহজিয়া মতের বহু কবি চণ্ডীদাসের ভণিতায় রাশি রাশি পদ রচনা করে অনাবশ্যক জঞ্জাল বাড়িয়েছেন। চতুর্থ চণ্ডীদাস সম্পর্কিত মতামতের ক্ষেত্রে পণ্ডিতেরা একে সপ্তদশ শতকের কবি আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এবং শ্রী চৈতন্যদেবের পরে। পণ্ডিতেরা একজন চতুর্থ চণ্ডীদাস সম্পর্কে মত প্রকাশ করলেও এ চণ্ডীদাসের কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। পণ্ডিতদের মতে এরও আগে যে তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তাদের

কবিকৃতি বিশালকায়। তাদের সৃষ্টিকর্ম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরাট পরিসরে স্থান দখল করে আছে এ কথা না বললেও খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

মধ্যযুগের বিস্তৃত পরিসরে প্রায় চারশ বছর ধরে চণ্ডীদাস নামধারী কবিগণ যেসব কবিতা রচনা করেছেন,তা পাঠক হৃদয় জয় করে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে। সাধারণ পাঠকের মনে কবির জীবন ও তথ্যের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ ছিল না,যতটা আকর্ষণ ছিল কবিতার রসের প্রতি। ফলে চণ্ডীদাস কতজন এ নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। চণ্ডীদাসের পদগুলোতে তার বিস্ময়কর প্রতিভার বিচ্ছুরণে কৃষ্ণ প্রেম সাধিকা শ্রীরাধার যে অপূর্ব মনোমুগ্ধকর রূপ ফুটে উঠেছে তা কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার রসপিপাসু পাঠক মনে যে পরিতৃপ্তি দিয়ে আসছে তার মূল্য অপরিসীম। চণ্ডীদাসের পদাবলী যুগ-যুগ ধরে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কিত চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি প্রকাশের পর। ইতিপূর্বে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে একজন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তার মন্তব্য ছিল এমনঃ- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জানা যাইতেছে যে,চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত,তিনি 'বড়–'উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং বাসুলী দেবীর আজ্ঞায় পদ রচনা করিতেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদেই বহু পূর্বে তাহার 'অনন্ত' নাম পাওয়া গিয়াছিল,তাঁহার 'বড়–' উপাধি ও বাসুলীর আদেশ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের সকলেই অবশ্য অবগত আছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি,তৎসম্বন্ধে আমাদের সংশয় নেই।'এরপর সংগৃহীত হয় চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত বিচ্ছিন্ন পদ ও কিছু পালাগান। পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হলে একাধিক চণ্ডীদাসের ধারণা বদ্ধমূল হয় এবং মণীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক ১৩৪১ বঙ্গাব্দে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হলে আরও জটিল হয়ে উঠে চণ্ডী সমস্যা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষা,রস ও রুচির সাথে পদাবলীর চণ্ডীদাসের কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। এ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়– চণ্ডীদাস ও পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাস ভিন্ন ভিন্ন কবি বলে পণ্ডিতদের ধারণা জন্মে। পরে মণীন্দ্রমোহন বসু পদাবলীর চণ্ডীদাসকে বড়– বা দ্বিজ চণ্ডীদাস না বলে দীন চণ্ডীদাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বড়– চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা এবং তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক

আখ্যান কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। ভাগবত অবলম্বনে রচিত এ আখ্যান কাব্যে তার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির যে স্ফুরণ ঘটেছে তা তাকে সে সময়কার শ্রেষ্ঠতম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করার সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান।

মনে করা হয় শ্রীচৈতন্যদেব কোন একজন চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন। কিন্তু বড়– চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণের প্রেম লীলা,উদ্দাম দেহ সম্ভোগের উত্তপ্ত আকাঙ্খাজনিত কাহিনীর বর্ণনা তার কাছে আস্বাদন যোগ্য হওয়ার কথা নয়। তিনি হয়তো অন্য কোন চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করতেন। কিন্তু পদাবলীর চণ্ডীদাসও মতবিরোধের ঊর্ধ্বে থাকেনি। পদের উৎকর্ষ অপকর্ষের ভিত্তিতে একাধিক চণ্ডীদাসের কথা ভাবা হয়েছে।

ডঃ সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসু দু'জন চণ্ডীদাসের উল্লেখ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন তিনজন চণ্ডীদাসের কথা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও তিনজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। ড. আহমদ শরীফও তিনজন চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে যে তিনজন চণ্ডীদাসের কথা জানা যায় তারা হলেনঃ -প্রাক চৈতন্য যুগের বড়– চণ্ডীদাস, প্রাক চৈতন্য যুগের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং চৈতন্যোত্তর যুগের পালাগান রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস।

১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়– চণ্ডীদাস ২) পদাবলীর দ্বিজ,দীন বড়– আদি প্রভৃতি ভনিতাযুক্ত চণ্ডীদাস ৩) পালাগানের দীন চণ্ডীদাস এবং ৪) সহজিয়া পন্থী রাগাত্মিকা পদের চণ্ডীদাস। বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে যে ক'জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের কথা জানা যায় তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়– চণ্ডীদাস সবচেয়ে প্রাচীন কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিশ্লেষণে

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেসব প্রাচীনত্বের লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন মধ্যযুগের অন্য কোন কাব্যে তা নেই। তিনি উল্লেখ করেছেন ১৩৭০ খ্রিষ্টাব্দে বড়– চণ্ডীদাসের জন্ম এবং ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর কথা।

চণ্ডীদাস সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামতের মধ্যে দেখা যায় ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে চণ্ডীদাস অভিন্ন। এই মত সমর্থন করেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। বসন্তরঞ্জন রায় পদাবলী ও

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে একজন মনে করেন। মণীন্দ্রমোহন বসু ও ড. শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্য পূর্ব বড়–চণ্ডীদাস ও চৈতন্য পরবর্তী দীন বা দ্বিজ একজন পদাবলীর চণ্ডীদাস মনে করেন। ড. সুকুমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ছাড়া অন্য কোন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। তিনজনের বেশি চণ্ডীদাসের কথা উল্লেখ করেছেন ড. বিমান বিহারী মজুমদার। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়– চণ্ডীদাস ছাড়া পদাবলীর আরও দুজন দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডী সমস্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলীর চণ্ডীদাসের অনন্য ও বিস্ময়কর প্রতিভার প্রশ্নে মত বিরোধের কোন সুযোগ নেই।

বৈষ্ণব পদাবলীর যে সব পদের অপরূপ সৌন্দর্য ও ভাবগাম্ভীর্য বাঙালি পাঠকের মনে চির মুদ্রিত হয়ে আছে তার বেশিরভাগ পদই রচনা করেছেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের ভাষা সহজবোধ্য, অনাড়ম্বর,কিন্তু তা অপূর্ব ব্যঞ্জনা শক্তিসম্পন্ন। বৈষ্ণব পদকর্তাগণের কৃতিত্ব বিচারের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন তাদের ছন্দ,অলংকার ও প্রকাশ বৈচিত্র্য বিচার্য,অন্যদিকে তেমনি তাদের অঙ্কিত রাধা চরিত্রের পরিকল্পনাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়। পদাবলী সাহিত্যের দুই দিকপাল চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি ছাড়া অপরাপর কবিগণ সাধারণত অনভিজ্ঞা বালিকা রাধাকে ধীরে ধীরে রসময়ী নায়িকাতে পরিণত করেছেন এবং পরিণতিতে আধ্যাত্মিকতার ভাব জাগ্রত করে তাকে অলৌকিক জগতে উন্নীত করেছেন। চণ্ডীদাসের কাব্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বে ভারাক্রান্ত নয়। চণ্ডীদাস কোন ধরণের ভূমিকা ছাড়াই রাধাকে কৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা রূপে অঙ্কন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলায় যেটুকু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোকপাত করা হয়েছে,চণ্ডীদাস সে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে গৌণ করে তাতে লৌকিক ভাব আরোপ করেছেন। চণ্ডীদাস রাধাকে আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন না করে রাধা চরিত্রের মাধ্যমে বিশ্বের মানবরূপী নারী হৃদয়ের বাণীকেই অপরূপ রূপ দিয়েছেন। চণ্ডীদাস পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি। রাধা তখনও কৃষ্ণকে দেখেনি,কিন্তু তার নাম শুনেছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তার বিস্ময়কর প্রতিভার বিচ্ছুরণ আর কবিত্ব শক্তির অভিনব প্রকাশে এ নামই রাধাকে আকুল করে তুলেছে।

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মন প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে।

চণ্ডীদাস তার কাব্যে আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেননি। তিনি মানব হৃদয়ের বিরহের আকুতিই প্রকাশ করেছেন তার পদাবলীর নায়িকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনুমিত বড়– চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। করো কারো মতে তার জন্ম বীরভূম জেলার নান্নুর নামক স্থানে। 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'তে বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের সাক্ষাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন বিদ্যাপতির সঙ্গে যে চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল তিনিই বড়– চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস তার পদে কিশোরী ভজন করেছেন। আলোচ্য চণ্ডীদাসেরও কিশোরী ভজনের নিদর্শন সুস্পষ্ট। যেমন-

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়– চণ্ডীদাস গায়

পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কতগুলো গীতের সমন্বয়। একাব্যে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতে ঘটনাবিবৃতি,নাট্যরস ও গীতিরসের অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনায় কবি যে ধরনের শিল্পরস বেছে নিয়েছেন তা গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট এবং অমার্জিত হলেও সমাজ বাস্তবতার সুরে পূর্ণ বেষ্টিত। তাই কাব্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিরাজমান সমাজ বাস্তবতা এবং প্রত্যক্ষ মানবরসের কাছে পরাভূত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে উদ্বৃত নিম্নের পংক্তিটির ভাষায় তা সুস্পষ্ট-

আঝর ঝর এ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলো পরাণী।
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
বাজএ সুসর বাশী নন্দের নন্দন।

চণ্ডীদাসের ভাষা সহজ,সরল,প্রাঞ্জল। তিনি ছন্দ ও অলংকারের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অতি সাধারণ বক্তব্যকে সুনিপুণ ও হৃদয়গ্রাহী করে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের রচনা থেকে। রাধার মনের বিচিত্র অনুভূতি তিনি বিরহের বেদনায় নিমজ্জিত করে বাঙালি পাঠক হৃদয়ের কাছে চিরদিনের সমাদর লাভের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন। সচেতন শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা না করে নিরাভরণ বৈরাগ্যের মধ্যেও যে কাব্যগুণ চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হতে পারে তার পদে সহজেই তা অনুধাবন করা যায়। রাধাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা রূপে চিত্রিত করেছেন। রাধার চরিত্রে মিলনের আনন্দের চেয়ে বিচ্ছেদের বেদনা তীব্রতর রূপ দিয়ে অতি সহজ সরল ভাষা ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে মর্মস্পর্শী করে কাব্যে বর্ণনা করেছেন।

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁনা জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক-জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥

কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।

না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল॥

কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।

ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥

আক্ষেপানুরাগের পদেও চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। রাধা স্থির করেছে কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে প্রেমাগুনের যন্ত্রনা থেকে নিস্কৃতি পাবে। কিন্তু-

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায়রে।

আন পথে যাইযে কানু পথে ধায়রে॥

এছার রসনা মোর হইল কি বামরে।

যার নাম নাহি লই লয় তার নামরে॥

কৃষ্ণের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগী রাধা আক্ষেপ করে বলেছে ‘ঘর কৈনু বাহির,বাহির কৈনু ঘর’তবু কৃষ্ণের প্রেম বুঝতে পারে না রাধা। না বুঝেও কৃষ্ণের নিকট জীবন যৌবন সমর্পন করেছে এবং মনে প্রাণে প্রার্থনা করেছে-

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।

রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়॥
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অহলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি।
তবে যে পরাণে মরি॥
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন।
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

চণ্ডীদাসের ভান্ডারে শব্দের তেমন কোন ঝংকার ছিল না। তিনি এ নিয়ে ভাবেনওনি। তাঁর ভান্ডারে দু'চারটি মাটির অলঙ্কার ও মাঠের ফুল ভিন্ন কোন হীরামানিক্য নেই। তার ভাষা সহজ সরল। তিনি অলঙ্কারহীন,নিরাভরণ জীবনের অশ্রুসিক্ত ব্যথিত দৃষ্টি উপহার দিয়েছেন এবং এই দিয়েই মানব হৃদয়ের গভীরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরে উল্লিখিত পদটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চণ্ডীদাস কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ অঙ্কন করতে গিয়ে বলেছেনঃ

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে

দহন দ্বিগুণ হয়॥

অবশেষে কৃষ্ণের সঙ্গে ভাব সম্মিলন হয়। অন্তরে কৃষ্ণের মূর্তি দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে মনের গহনে রাধা তাকে লাভ করেছে। কৃষ্ণ তাকে ভুলে মথুরায় ছিল। কিন্তু সেজন্যে কোন ক্ষোভ নেই। অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেও রাধা প্রেমস্পদের কুশল প্রার্থিনী।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত প্রাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলেত ভাল॥

বেদনার সমুদ্র রোমন্থন করলে যে অমৃত উত্থিত হয় তাই হচ্ছে প্রেম। প্রেম বেদনার ধন। তাই সুখের আশায় চণ্ডীদাসের রাধা প্রেম চায়না। কারণ সে জানে সুখের আশায় যে প্রেম করে সে দুঃখই পায়। চণ্ডীদাসের রচনায় পাণ্ডিত্যের বাহুল্য নেই। চিরন্তন বিষয় বস্তুর উপর কবিত্ব আরোপ করেছেন তিনি। অন্তরের সম্পদকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়েছেন। বিদ্যাপতি সুখের কবি,চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হয়ে পড়েন,চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নেই। বিদ্যাপতির অনেকস্থলে ভাষার,সৌন্দর্য বর্ণনার মাধুর্য আছে কিন্তু চণ্ডীদাসের নতুনত্ব আছে,ভাবের মহত্ব আছে,আবেদনের গভীরতা আছে। ভাব,ভাষা,ছন্দ প্রভৃতি কাব্যের সকল অঙ্গই চণ্ডীদাসের সুনিপুণ লেখনীতে অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। তার মত সহজ ভাষায় এবং নিতান্ত সাধারণ কথা এমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অনুভূতি আর কোন কবি বর্ণনা করতে পারেননি। সহজ কথা সহজ করে বলা মোটেই সহজ নয়। চণ্ডীদাসের হৃদয়ানুভূতি এত প্রবল যে,রাধার বিরহক্লিষ্ট হৃদয় বেদনা তিনি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। অলংকার পড়িয়ে কবি তার ভাবকে ভাষায় পরিপাটি করেননি। অবশ্য চণ্ডীদাস অলংকারবহুল পদও বহু রচনা করেছেন। কিন্তু সেটি তার আসল পরিচয় নয়। চণ্ডীদাসের আসল পরিচয় হচ্ছে এই যে,তিনি সরল প্রাণের একজন সহজ কবি।

চণ্ডীদাসের ভাষা জাতির হৃদয়কে সিক্ত করেছিল। এই ভাষা এখন পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে একটি ক্ষীণস্রোত ও নিত্য নতুন রস সঞ্চার করে চলেছে। কবি চণ্ডীদাস এক অসামান্য প্রতিভাবলে বাঙালির ব্যবহৃত সংস্কৃত-প্রাকৃত,আরবি-ফারসি ও দেশজ শব্দসমুদ্র থেকে সহজ সরল প্রাঞ্জল সেই মণিমুক্তাগুলো আহরণ করতে পেরেছেন। এই ভাষাই বৈষ্ণব সাহিত্যের সাধারণ ভাষা। কবি চণ্ডীদাসের ভাষা। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রামীর অন্তরঙ্গ প্রেমের সম্পর্ক ও বিষাদময় পরিণতির কথা চণ্ডীদাস-রামীর প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচিত। রামী কেবল চণ্ডীদাসের সাধন সঙ্গিনী রূপেই খ্যাত নন। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। ড. দীনেশচন্দ্র সেন তার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'গ্রন্থে রামীর লেখা যে কটি পদ উদ্ধৃত করেছেন,সেগুলোতে চণ্ডীদাসের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। একটি পদে রামী লিখেছেন-

সুদ্ধ কলেবর,হইল জর্জর
দারুণ সঞ্চান ঘাতে।
এ দুঃখ দেখিয়া,বিদর এ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন বামিনী,শুন গুণ মনি
জানিলাঙ তোমার রীতি।
বাসুলি বচন,করিলে লঙ্ঘন
শুনহ রসিক পতি॥

এছাড়া চণ্ডীদাস রজকিনী বা চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমের উপাখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙালির হৃদয় জুড়ে আছে চণ্ডীদাস ও রামী। এ দুই প্রেমিক কবি কিংবদন্তির নায়ক-নায়িকা রূপে যুগে যুগে আপামর বাঙালির মনের গভীরে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙালি তাই তাদের পদাবলী কীর্তন করে ভাবে বিভোর হয়ে শ্রদ্ধান্বিত হয় চণ্ডীদাস রামতারা বা রামীর প্রতি। সবশেষে বলা যায় চণ্ডীদাস অনন্য প্রতিভাশালী কবির পাশাপাশি বাঙালির হৃদয়ে গাঁথা বেদনা-বিধুর এক প্রেম কাহিনীর নায়ক,বিরহের বার্তাবাহক রামীর প্রেম সম্পদ হিসেবেও বাঙালির মনে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

তথ্যঋণ এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা:-

সুকুমার সেন
দীনেশ চন্দ্র সেন
মণীন্দ্রমোহন বসু
নুরুল আমিন রোকন।

একশো বছরে সন্দেশ

অতনু কুমার

আমাদের বাড়িতে পিওন চিঠি বিলি করতে আসত বিকেল চারটের সময়। আমি স্কুল থেকে ফিরতাম মোটামুটি সাড়ে চারটেয় আর স্কুল থেকে ফিরে প্রথম কাজটাই ছিল কি কি চিঠি এসেছে খোঁজ করা,বিশেষ করে মাসের প্রথমদিকে। রোজই বাবার নামে প্রচুর চিঠিপত্র আসত,সেসব হাঁটকে আমি খুঁজতাম একটা দুভাঁজ করা পত্রিকা,গায়ে জড়ানো একফালি ব্রাউন কাগজ, যাতে লেখা থাকত, "অতনু কুমার, গ্রাহক সংখ্যা ৩৫০০,প্রযত্নে..."। বলা বাহুল্য বেশীরভাগ দিনই নিরাশ হতে হত;কখনও কখনও দুমাস বা তিনমাস অপেক্ষার পর তার দেখা পেতাম,যদিও মলাটের ওপর জ্বলজ্বল করত "ছোটদের সেরা মাসিকপত্র"। পুজোসংখ্যাটা আসত রেজিস্ট্রি ডাকে,সই করে নিতে হত। "বিশেষ সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে, সাধারণ সংখ্যা সাধারণ ডাকে", গ্রাহক চাঁদা ১৮০ টাকা। মেজপিসি আমাদের বাড়ির আরো অন্য অনেকের সঙ্গে প্রথমে দাদাকে,পরে আমাকে "সন্দেশ"এর গ্রাহক করে দিয়েছিল। সেই শুরু,তারপর আর সন্দেশকে ছাড়তে পারিনি। এখন অবশ্য আর গ্রাহক নই,কিন্তু যাতায়াতের পথে স্টেশনের বুকস্টলটায় খেয়াল রাখি,নতুন সন্দেশ এলেই যাতে তুলে নেওয়া যায়,আর কোন সংখ্যা মিস হলে বইমেলার স্টল থেকে নিয়ে নিই। সেই সন্দেশ আজ একশো বছর পূর্ণ করল। এই অবকাশে ধূলো ঝেড়ে পুরনো সন্দেশ ঘাঁটতে বসলাম। কেননা পুরনো সন্দেশ তো নতুনের চেয়েও মিষ্টি!

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে,রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দুই বছরের ছোট কামদারঞ্জন রায়ের জন্ম হয় ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামে। ময়মনসিংহেরই জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে দত্তক নিয়ে নতুন নাম দেন উপেন্দ্রকিশোর। এন্ট্রান্স পাস করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে কলকাতায় আসেন। সেই সময়ের কলকাতা ছিল চাঁদের হাট,বিদ্যাসাগর,বঙ্কিমচন্দ্র,গিরিশ ঘোষরা তখনও বিদায় নেননি,তার সঙ্গে উঠে আসছেন নতুন তারকারা,রবীন্দ্রনাথ,জগদীশচন্দ্র,প্রফুল্লচন্দ্র,আরো কতজন। গ্রামে থাকতেই বোঝা গিয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর সাধারণ ছেলে নন,কিন্তু কলকাতার আবহাওয়া তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের রাস্তা খুলে দেয়। একদিকে "সখা","মুকুল" প্রভৃতি ছোটদের পত্রিকায় লেখা,আঁকা,অন্যদিকে ব্রাহ্ম আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ,ব্রাহ্মসঙ্গীত লেখা ও

সুর দেওয়া - অচিরেই বাংলার নবজাগরণের অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠলেন উপেন্দ্রকিশোর। শুধু শিল্প-সঙ্গীতে নয়,তাঁর সমান আগ্রহ ছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায়,বিশেষতঃ মুদ্রণশিল্প ও ফটোগ্রাফিতে। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সিটি বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত "ছেলেদের মহাভারত" আর "ছেলেদের রামায়ণ" বইদুটিতে তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলোর দুর্দশা দেখে তিনি ঠিক করলেন নিজেই মুদ্রণ প্রযুক্তি নিয়ে চর্চা করবেন। লন্ডনের "পেনরোজ অ্যান্ড কোম্পানি" থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে "ইউ রায় আন্ড সন্স" নামে ছাপাখানা খুললেন। "হাফটোন ফটোগ্রাফি ও প্রিন্ট" নিয়ে গবেষণা চালিয়ে শুধু পদ্ধতিটার উন্নতি করলেন তাই নয়,এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তুলে ধরলেন,যা এতদিন ছিল না।[১-৩]

১৩২০ সনের (১৯১৩ সাল) পয়লা বৈশাখ ইউ রায় আন্ড সন্স থেকেই প্রকাশিত হয় "ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র" সন্দেশের প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী,বি-এ। প্রথম পৃষ্ঠাতে সন্দেশের আগমনবার্তা জানিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী লেখেন,

"নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে,

সন্দেশ এসেছে আজ নব সাজ প'রে।

ডাকিয়া লইব তারে আদরে সবাই,

হাসিমুখে ত্বরা করে আয় তোরা ভাই।..."

"সন্দেশের কথা"য় বলা হয়েছিল, *"... আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া আজ সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে,ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে, -অর্থাৎ ইহা পড়িয়া সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয় তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।"* সেই অনুযায়ী ছড়া,কবিতা,পুরাণ ও দেশবিদেশের গল্প,অনুবাদ, বিজ্ঞান,মহাকাশের কথা,জীবজন্তু,ভ্রমণকাহিনী,মনিষীদের জীবনকথা,ধাঁধা ইত্যাদিতে ভরে উঠল সন্দেশের পাতা। "সংবাদ" শিরোনামে পৃথিবীর নানা মজার ঘটনার খবর থাকত। আর ছিল রঙিন ও সাদাকালো

প্রচুর ছবি। খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, *"...'সন্দেশে'র বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব ছিল না। ... কিন্তু রচনায়,পরিবেশনে,সাজসজ্জায়,ছাপায় 'সন্দেশ' ছিল অতুলনীয়। ছবিগুলি সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত হত যা পূর্বের ছবিগুলিতে দেখা যায় না। বিজ্ঞান,রসসাহিত্য ও চিত্রশিল্প - এই তিন মিলিয়ে নিপুণ হাতে 'সন্দেশ' তৈরী হত। ..."* [8] রায়পরিবারের সদস্যদের লেখায় লেখকের নাম থাকত না। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ,নজরুল,শিবনাথ শাস্ত্রী,প্রিয়ম্বদা দেবী,সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,কালিদাস রায়,অতুলপ্রসাদ সেন,প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। বেশীরভাগ লেখা ও আঁকা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের। সন্দেশ প্রকাশের কয়েকমাস পরেই দেশে ফেরেন সুকুমার। তাঁর "আবোল তাবোল" ও অন্যান্য লেখা,ছবিসমেত সন্দেশেই প্রথম বেরোয়। জরিপের কাজে বন-জঙ্গলে ঘোরার সুবাদে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হত প্রমদারঞ্জন রায়ের "বনের খবর"।

দ্বিতীয় সংখ্যায় ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের জন্মদিন উপলক্ষে লেখা হয়, *"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি,আমাদের প্রিয় সম্রাট দীর্ঘজীবী হইয়া আরো অনেক বৎসর সুখে রাজ্য ভোগ করুন"* । বাঙালী জর্জসাহেবকে "প্রিয় সম্রাট" বলে আহ্লাদ করত কি না সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই বাঙালীদের বেআদবীতে অতিষ্ঠ হয়েই তো জর্জসাহেবের পেয়াদারা বছর আষ্টেক আগে দেশটাকে টুকরো করার চেষ্টা করেছিল, মাত্র দুবছর আগে তারা রণে ভঙ্গ দেয়। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন ক্ষুদিরাম,প্রফুল্ল চাকী,আলিপুর বোমা মামলায় কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়েছে। বছর দুয়েক বাদেই বুড়িবালামের যুদ্ধে শহীদ হবেন বাঘাযতীন। কিন্ত তৎকালীন বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষরা অনেকেই ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করতেন। এমনকি জর্জসাহেব ভারতে এলে,তাকে প্রশস্তি করে গান গাওয়া হয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে। তাই সন্দেশের পাতায় এহেন রাজবন্দনায় খারাপ লাগলেও অবাক হবার কিছু নেই।

সন্দেশের আড়াই বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর "ইউ রায় অ্যান্ড সন্স" এবং সন্দেশের দায়িত্ব নেন সুকুমার। সুকুমারের হাতে পড়ে সন্দেশের চরিত্র খানিকটা বদলে যায়।

“উপেন্দ্রকিশোর বিশেষ করে যে বয়সের পাঠকদের কথা চিন্তা করতেন,গড়ে তারা বড়জোর ১০/১২ বছরের বালক। কিন্ত সুকুমারের সম্পাদনায় ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের পাঠ্য যথেষ্ট থাকলেও ১৫/১৬ বছরের পাঠকরাও প্রচুর চিন্তার খোরাক পেত।” [২] ১৯২৩ সালে মাত্র ছত্রিশ বছরে মৃত্যুর আগে পৌনে আট বছর সন্দেশের সম্পাদনা করেছেন সুকুমার। সুকুমার রায় কে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। বাঙালী যতদিন থাকবে,সুকুমার পুরানো হবেন না। আবোল তাবোল,খাই খাই,হযবরল ছাড়াও অজস্র ছোটগল্প,কবিতা,নাটক,জীবনকথা,বিজ্ঞান রচনা,ধাঁধা তিনি সন্দেশে লিখেছেন এই কটা বছরে। প্রায় সমস্ত ছবিই তিনিই আঁকতেন। সম্পাদনার কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন বিশেষ করে কাকা কুলদারঞ্জন ও ভাই সুবিনয়। তাছাড়া অন্য পাঁচ ভাইবোন সুখলতা,পুণ্যলতা,সুবিমল আর শান্তিলতাও নিয়মিত লিখতেন সন্দেশে। এই সময়ে সম্পাদক ছাড়া সকলের লেখাতেই নাম ছাপা হত। সুকুমাররের মৃত্যুর পর সুবিনয় রায় সম্পাদক হলেন। *“সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায় সন্দেশে আরো বেশী সংখ্যক বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের সরস সচিত্র প্রবন্ধ পাওয়া গেল। এই সময়ে প্রকাশিত ধাঁধা আর প্রতিযোগিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবু এই সার্থকনামা সন্দেশ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হল। কারণ ব্যবসায়িক কারণে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স নামে বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা বন্ধ হয়ে গেল।”* [৫]

সন্দেশ উঠে যাওয়াতে লেখক ও পাঠকরা খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন আর সম্ভবতঃ সেটা বুঝতে পেরেই “ইউ রায় অ্যান্ড সন্স”-এর নতুন মালিকরা সন্দেশ আবার বের করার সিদ্ধান্ত নেন। পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর সুবিনয় রায়ের সঙ্গে সুধাবিন্দু বিশ্বাসের যুগ্ম সম্পাদনায় নবপর্যায়ের সন্দেশের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ সনের (১৯৩১ সাল) আশ্বিন মাসে। উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশের অনুরাগী পাঠক ছিলেন কবি সুনির্মল বসু। নতুন সন্দেশের প্রথম পাতার কবিতাটা তিনিই লিখলেনঃ

“সন্দেশ এলো ফের, --মন খুশি খবরে--

সেই চিরপুরাতন--তবু অভিনব রে!

সন্দেশ, সন্দেশ,--

ছিলি তুই কোন্ দেশ ?

এ যে রে মোহন বেশ

দেখি ফের তব রে!—”

সত্যজিৎ রায় লিখছেন,“বাবা মারা যাবার পর বছর দুয়েকের মধ্যেই সন্দেশ উঠে যায়। তখনও আমার সন্দেশ পড়ার বয়স হয়নি। টাটকা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে হাতে নিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা হল এই দ্বিতীয় পর্বে। মলাটে তিনরঙা ছবি,হাতি দাঁড়িয়ে আছে দু'পায়ে, শুঁড়ে ব্যালান্স করা সন্দেশের হাঁড়ি। এই সন্দেশেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম সংখ্যা থেকে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের ‘সে’, আর এই সন্দেশেই প্রথম গল্প লিখলেন লীলা মজুমদার। ওনার গল্পের সঙ্গে মজার ছবিগুলো উনি তখন নিজেই আঁকতেন। অন্য আঁকিয়েদের মধ্যে ছিলেন এখনকার নামকরা শৈল চক্রবর্তী, যাঁর হাতেখড়ি সম্ভবত হয় এই সন্দেশেই।” [৬] এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো,লীলা মজুমদারের (তখন রায়) প্রথম গল্প “লক্ষ্মী ছেলে” বেরিয়েছিল প্রথম পর্যায়ের সন্দেশে,তাঁর বড়দা সুকুমারের উৎসাহে। কিন্তু এই গল্পটি লেখিকার পছন্দ হয়নি বলে তিনি এটি কোন বইতে অন্তর্ভূক্ত করেননি। নবপর্যায়ের সন্দেশে রায়চৌধুরী পরিবারের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমে গেল,লেখার বৈচিত্র্য বাড়ল এবং সন্দেশ ক্রমশ কিশোরদের পত্রিকা হয়ে উঠল। দুই সম্পাদক ছাড়া রবীন্দ্রনাথ,প্রিয়ম্বদা দেবী,সুনির্মল বসু,দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,বন্দে আলি মিঞা,ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,ননীগোপাল মজুমদার,শিবরাম চক্রবর্তী ও আরো অনেক লেখক-লেখিকা এই পর্যায়ে লিখেছেন। গ্রাহকদের পাঠানো নির্বাচিত লেখাও ছাপা হত। ধাঁধার উত্তর যাঁরা পাঠাতেন তাদের নাম,ঠিকানাসহ ছাপা হত পরের সংখ্যায়। এই নামের তালিকায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সন্দেশের পাঠকরা ছড়িয়ে ছিল কলকাতা, ভাটপাড়া,কৃষ্ণনগর থেকে শুরু করে ময়মনসিংহ,চট্টগ্রাম,রাঁচি,ভাগলপুর,দিল্লি, শ্রীনগর পর্যন্ত। কিন্তু বেশীদিন সন্দেশ চালানো গেল না। চার বছর পর সন্দেশ আবার ঝাঁপ বন্ধ করল। শেষ দেড় বছর (বৈশাখ ১৩৪১-ভাদ্র ১৩৪২) সম্পাদক ছিলেন এককভাবে সুধাবিন্দু বিশ্বাস।

এরপরের সন্দেশ জানতে হলে লাফ দিয়ে পেরোতে হবে আঠাশটা বছর। মাঝখানে বাংলা তথা পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোল ওলট-পালট হয়ে গেছে। ফ্যাসিবাদের উত্থান ও

পতন,মহামারী,দাঙ্গা,দেশভাগের বিনিময়ে বহুপ্রতীক্ষিত স্বাধীনতা আর তার ধাক্কায় অগণিত মানুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে অজানা ভবিষ্যতের পথে যাত্রা। স্বাধীন দেশে খাদ্য চাইতে শহরে আসা মানুষকে মরতে হল লাঠির বাড়ি খেয়ে। হয়তো পথের ক্লান্তি কাটাতেই এক মার্কসবাদী কবি,তাঁর শিল্পী বন্ধুর কাছে সন্দেশ আবার বের করার প্রস্তাব দিলেন। সুকুমার রায়ের পুত্র এই শিল্পীবন্ধুটি তখন কমার্সিয়াল আর্টিস্টের কাজ ছেড়ে সিনেমা তৈরীতে নেমে পড়েছেন। বাংলা সাহিত্যের গোটাপাঁচেক মাস্টারপিসকে পর্দায় নামানোর পর রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটা তথ্যচিত্র আর তিনটে গল্প নিয়ে একটা কাহিনীচিত্র বানাতে ব্যস্ত। দায়িত্বগ্রহণে দ্বিধা থাকলেও মায়ের উৎসাহে রাজি হয়ে গেলেন। *"ইউ রায় অ্যান্ড কোম্পানির স্বত্ব যাঁরা কিনেছিলেন-তাঁদের খুঁজে বার করা হল।তাঁদের কাছ থেকে 'সন্দেশ' প্রকাশের অনুমতি সংগ্রহ করা গেল। তবু নতুন এক বিপত্তি দেখা দিল। সন্দেশ পত্রিকার নাম স্বত্ব সংগ্রহ করেছিলেন হাওড়া জেলার তারাপদ সাঁতরা। ... তাঁর 'সন্দেশ' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে নিবন্ধ ও সংবাদ প্রকাশিত হত। ... সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরনো রাজনৈতিক যোগাযোগের সুবাদে সহজে তাঁর কাছে পৌঁছানো গেল। ... ১৭২ নং ধর্মতলা স্ট্রিট (লেনিন সরণি)-এর দোতলায় অফিস ঘর ভাড়া নেওয়া হল। সম্পাদক হলেন সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রাহক সংগ্রহ শুরু হয়ে গেল। ১৩৬৮র বৈশাখ (১৯৬১-র মে) মাসে এ বারের (তৃতীয় পর্যায়ের) সন্দেশের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল।"* [৭]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অবশ্য বেশীদিন থাকেননি। দুবছর পর তাঁর বদলে সম্পাদক হলেন লীলা মজুমদার। প্রকাশক অশোকানন্দ দাশ। সন্দেশ চালানোর জন্য গঠিত হল "সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি"। ১৩৮২তে লীলা মজুমদার,সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন নলিনী দাশ। অবশ্য সন্দেশের অফিস তাঁর রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে উঠে যাওয়ার পর থেকেই তিনি সন্দেশের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায় সন্দেশের পুনর্জন্ম দিয়েছিলেন এটা যেমন ঠিক,তেমনি এটাও ঠিক,যে সন্দেশই সত্যজিতের হাতে আবার কলম ধরিয়েছিল। কুড়ি বছর আগে অমৃতবাজার পত্রিকার রবিবারের

পাতায় প্রকাশিত দুটো ইংরেজি গল্পের কথা বাদ দিলে বলতে হয় সন্দেশের জন্যই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। প্রথমে লুই ক্যারল আর লিয়রের কিছু ননসেন্স ছড়া আর লিমেরিক অনুবাদ করার পর ষষ্ঠ সংখ্যাতেই হাজির করলেন প্রোফেসর শঙ্কুকে। তারপর পর পর দুটো ছোটগল্প "বঙ্কুবাবুর বন্ধু" আর "টেরোডাকটিলের ডিম"। তারপর আর থামেননি। ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি শুরু হয় ছয় বছর পরে। পরবর্তীকালের বেস্টসেলার লেখাগুলোর বেশীরভাগই সন্দেশে প্রথম বেরিয়েছিল। তাছাড়াও অজস্র প্রবন্ধ,স্মৃতিকথা,কমিক স্ট্রিপ,পাদপূরণ,ধাঁধা,শব্দজব্দ ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে সন্দেশের পাতায়,যা এখনো বই হয়ে বেরোয়নি। আর বাবা ও ঠাকুরদার ধারা বজায় রেখে প্রচ্ছদ ও বেশীরভাগ অলঙ্করণ, হেডপিসও সত্যজিৎ নিজেই করতেন।

আরেক সম্পাদক লীলা মজুমদার অবশ্য তখনই জনপ্রিয় লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সন্দেশের প্রথম সংখ্যাতে শুরু হয় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস "টংলিং"। গল্প,প্রবন্ধ,নাটক,উপন্যাসের পাশাপাশি থাকত তাঁর অননুকরনীয় ভাষায় "গল্পস্বল্প"-এর মজলিশ। সুবিনয় রায়ের আমলেও "গল্পস্বল্প" নামে একটা বিভাগ ছিল,কিন্তু সেখানে মূলত দেশ-বিদেশের মজার মজার খবর থাকত। এবারের গল্পস্বল্পে আড্ডার মেজাজে গল্প শোনানোর পাশাপাশি পাঠকদের নানা সামাজিক বিষয়ে সচেতন করারও চেষ্টা থাকত। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। *"...সমান অধিকার মানেই সমান দায়িত্ব। বিয়ের সময় বরপক্ষের এটা চাই ওটা চাই যে একেবারে বেআইনী একথা তোরা ভালো করেই জানিস,তবু মেনে নিস কেন? লেখাপড়া শেখ,নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। নইলে পুরুষরা মেয়েদের যত অসম্মান করে,তোরা নিজেরা তার চেয়ে ঢের বেশী করিস।..."* [৮]

অধ্যাপনা থেকে অবসর নেওয়ার পর সন্দেশের কাজেই নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন নলিনী দাশ। সম্পাদনার পাশাপাশি প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন,মার্কেটিং,কার্যালয়ের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজ তিনিই সামলাতেন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়ে। আর লেখালিখি তো ছিলই। চারটে স্কুলের মেয়ের আডভেঞ্চার নিয়ে তাঁর গোয়েন্দা গণ্ডালু সিরিজ সন্দেশীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত লেখকরা তো লিখতেনই,তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উঠতি প্রতিভাকে লালন করার দায়িত্বও নিল সন্দেশ। তিন সম্পাদকের হাতে তৈরী হয়েছিল শিশিরকুমার মজুমদার,অজেয় রায়,রেবন্ত গোস্বামী,গৌরী ধর্মপালের মত অনেক আশ্চর্য লেখক। "তৈরী হয়েছিল" কথাটা যে অতিরঞ্জন নয় তার প্রমাণ রাখা আছে তিন সম্পাদকের নিজেদের মধ্যে এবং লেখকদেরকে লেখা চিঠি ও চিরকুটের মধ্যে।[৯-১১] একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক আর একজন ব্যস্ততম লেখিকা এক একটা লেখার পিছনে যে সময় ও মনোযোগ দিতেন,লেখাটিকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে বা কখনও কখনও লেখকদেরকেই ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে নতুন করে লেখার নির্দেশ দিতেন,তা ধরা আছে এই সমস্ত চিঠিতে,যার বেশিরভাগই অবশ্য এখনো সামনে আসেনি। একই কথা প্রযোজ্য শিল্পীদের ক্ষেত্রেও। *"নামী শিল্পীদের ছবি তাঁদের যোগ্য পারিশ্রমিক দিয়ে সন্দেশে ব্যবহার করা সম্ভব ছিলনা। এর ফলে নতুনদের জন্য সন্দেশকে সর্বদাই দরজা খোলা রাখতে হত এবং আজও হয়।"* [১২] সন্দেশের হাত ধরে যে সমস্ত শিল্পী উঠে এসেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবাশীষ দেব ও শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাছাড়া প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়,সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়,সুবীর রায় সন্দেশে প্রচুর অলংকরণ করেছেন। আর ছিলেন প্রসাদ রায়,ময়ূখ চৌধুরী নামে যিনি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক ও অ্যাডভেঞ্চার কমিকস আঁকতেন।

তিন সম্পাদক কিভাবে কাজ করতেন তার একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রাহুল মজুমদার,*"লেখা জমা পড়লে সেটাকে নথিভুক্ত করার পর সব লেখা প্রথম পড়তেন নলিনীদি। উনি দেখতেন লেখাটা সন্দেশের আদর্শ আর মানের উপযুক্ত হল কিনা। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর সেই লেখাগুলো বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে পাঠিয়ে দিতেন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ সন্দেশীর কাছে। তাঁরা মন্তব্য আর প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখে ফেরৎ পাঠাতেন নলিনীদির কাছে। এরপর উনি বাছাই করা লেখাগুলো পাঠিয়ে দিতেন লীলাদির কাছে। লীলাদি মূলতঃ বিচার করতেন লেখার রস। দ্বিতীয় বাছাইয়ের পর লেখাগুলো আবার আসত নলিনীদির কাছে। এবার ভরতদা বা অশোকের হাত দিয়ে সেগুলো চলে যেত নলিনীদির ভাষায় বড় সম্পাদক অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের কাছে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য। তিনি মান,রস ছাড়াও দেখতেন লেখার কারিগরি বা টেকনিকাল দিকটাও।*

এতগুলো ছাঁকনির ভিতর দিয়ে ছেঁকে বেরিয়ে আসা লেখাগুলোর গুণগত মান সম্পর্কে কারও আর কোনও সন্দেহ থাকত না।" [১৩]

অন্যান্য পত্রিকার মতই সন্দেশে থাকত বেশ কিছু নিয়মিত বিভাগ যেমন বই চেনো,পত্রবন্ধু হতে চাই,বুনো রামনাথের দপ্তর,খেলাধুলা,বিজ্ঞানের আসর,হাত পাকাবার আসর,প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর ইত্যাদি। শেষোক্ত বিভাগটি ছিল অভিনব। সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এবং বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরামর্শে গড়ে ওঠা এই প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতিকে জানা,বোঝা ও ভালবাসা এবং তা বই পড়ে নয়,মাঠে ঘাটে ঘুরে। জীবন সর্দারের নেতৃত্বে প্রকৃতি পড়ুয়ারা মাসে একদিন সন্দেশের কার্যালয়ে পাঠশালায় বসত, অভিযানেও বেরোত।[১৪] হাত পাকাবার আসরে ১৭ বছরের কমবয়সী গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা ও আঁকা ছাপা হত এবং সংখ্যায় অনেক কমে গেলেও এখনও হয়।

সন্দেশের সম্পাদক থেকে শুরু করে লেখক,শিল্পী,গ্রাহক,এমনকি কার্যালয়ের কর্মীরা নিজেদের এক বিরাট পরিবারের অংশ বলে মনে করে। তারা নিজেদের নাম দিয়েছেন সন্দেশী। সন্দেশের প্রতি তাঁদের আবেগ আর ভালোবাসা তা বাইরের কারো পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। এই ভালোবাসার টানেই কঠিন আর্থিক সঙ্কটেও সন্দেশ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি পরিচালকরা। প্রতিবছর সন্দেশীদের অনুষ্ঠান বা পৌষমেলা,কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণের বিবরণ পড়লে খানিকটা বোঝা যায় সেই আবেগের চরিত্র।[১৫,১৬]

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে একের পর এক ইন্দ্রপতনে বিপর্যস্ত হল সন্দেশ। একে একে বিদায় নিলেন অশোকানন্দ দাশ,সত্যজিৎ রায়,নলিনী দাশ,শিশিরকুমার মজুমদার। অসুস্থতার জন্য দৈনন্দিন সম্পাদনার কাজ থেকে অবসর নিলেন লীলা মজুমদার। আমি যখন সন্দেশ পড়তে শুরু করি তখনও সম্পাদক হিসেবে ছাপা হত লীলা মজুমদার ও বিজয়া রায়ের নাম। কিন্তু ব্যাটনটা তখন চলে গেছে পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ সন্দীপ রায়,রেবন্ত গোস্বামী,প্রণব মুখোপাধ্যায়,জীবন সর্দারদের হাতে। প্রকাশকের দায়িত্ব নিয়েছেন অমিতানন্দ দাশ। উপরোক্ত পরিচালকরা ছাড়া নিয়মিত লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সলিল চট্টোপাধ্যায়,ভবানীপ্রসাদ মজুমদার,অরুণিমা

রায়চৌধুরী,প্রসাদরঞ্জন রায়,হর্ষমোহন চট্টরাজ,পার্থ দাশ প্রমুখ। দেবাশিস সেনের খেলার গল্প আর অরুণিমা রায়চৌধুরীর রূপকথা খুব ভালো লাগত মনে আছে। গল্পস্বল্প লিখতেন সুজয় সোম ও রেবন্ত গোস্বামী। সুজয় সোম খানিকটা লীলা মজুমদার কে অনুসরণ করার চেষ্টা করলেও রেবন্ত গোস্বামী লিখতেন নিজস্ব ঢঙে। অমিতানন্দ দাশ লিখতেন বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা আর খেলাধূলার দায়িত্বে ছিলেন বল বয়। ফেলুদা আর গুপী-বাঘার ছবিগুলোর চিত্রনাট্য ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। পুরনো সন্দেশ থেকে প্রচুর লেখা থাকত। বেশিরভাগ সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদগুলোই রঙ বদলে ব্যবহার করা হত,তবে মাঝে মাঝে সন্দীপ রায়ও প্রচ্ছদ আঁকতেন। শারদীয়া সংখ্যায় বিখ্যাত লেখকরা লিখতেন,কিন্তু সাধারণ সংখ্যাগুলোয় লেখার মান পড়ে আসছিল। এর মধ্যে ফেলুদার ৩০ বছর,লীলা মজুমদারের ৯০ বছর আর আবোল তাবোলের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যাগুলো সুন্দর আর সংগ্রহযোগ্য হলেও খুব ছোটদের পক্ষে খানিকটা গুরুপাক হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়।

হাত পাকাবার আসরটা তখনও বেশ জমজমাট ছিল। গল্প,কবিতা,ছড়া,প্রবন্ধ,ভ্রমণ,এমনকি কমিকস পর্যন্ত আসত গ্রাহকদের কলম থেকে। যাদের লেখা ও আঁকা ভালো লাগত তাদের মধ্যে মনে পড়ছে হিমন মুখোপাধ্যায়,দীপাঞ্জন রায়,অন্তরীপ সেনগুপ্ত,তওফীক রিয়াজ,পরমা ঘোষ মজুমদার,শঙ্খশুভ্র মল্লিক আর রাকা দাশগুপ্তর নাম। একমাত্র শেষজনকে বাদ দিলে বাকিরা এখনও লেখালিখি চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিনা। এই লেখাটা তাদের কারো চোখে পড়লে সামনে এসে জানান দিতে অনুরোধ করছি। হিমনকে অবশ্য পাওয়া যাবে না,সে অনেকদূরে চলে গেছে। আর রাকা দাশগুপ্ত এখন বাংলা কবিতার জগতে অত্যন্ত পরিচিত একটা নাম। পাশাপাশি ছোটদের জন্য লেখালিখিও সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছে সন্দেশ ও অন্যত্র।

এই সুযোগে নিজের ঢাকটা একটু পিটিয়ে নিই। ছোটবেলা থেকেই ডায়েরির পাতায় হিজিবিজি কাটতাম অন্য সকলের মত। সেরকমই একটা লেখা খামে ভরে সন্দেশের ঠিকানা লিখে একদিন ফেলে দিলাম লাল রঙের ডাকবাক্সে। তারপর হাত পাকাবার আসরে ছাপা হল “অভয়দাদুর বই”। গল্পটায় গুপিদা নামে একটা চরিত্র ছিল,যেটা আসলে কাঁচা হাতে করা টেনিদার কপি। তাতে

কি!সেদিন নিজেকে মনে হয়েছিল একজন কেউকেটা,স্কুলে যাওয়ার সময় জামার কলারটা নামাতে ভুলে গেলাম। রাস্তায় মনে হল যেন সবাই আমার দিকেই দেখছে!পরে আরো গোটাতিনেক গল্প লিখেছি হাত পাকাবার আসরে,প্রতিবারই সন্দেশের পাতায় নিজের নাম দেখে একই রকম অনুভূতি হয়েছে।

উদার অর্থনীতি আর বিশ্বায়নের ধাক্কায় বাঙালী মধ্যবিত্তর রুচি ও সংস্কৃতি দ্রুত পাল্টে যেতে লাগল। কেরিয়ার সচেতনতা ও ইঁদুরদৌড় ছোটদের অবসর সময় অনেকটা কেড়ে নিল। যেটুকু ছিল তা দখল করতে এগিয়ে এল কেবল টিভি ও ইন্টারনেট। একদিকে পত্রিকা প্রকাশের খরচ ও ডাকমাশুল উর্ধমুখী হল,অন্যদিকে গ্রাহক সংখ্যা কমতে লাগল। এতসব প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করার মত সাধ্য ও নেতৃত্ব সন্দেশের ছিলনা। এমন সময় টাকার থলি নিয়ে উদয় হল ফোর্ড ফাউন্ডেশন। সন্দেশকে ঢেলে সাজাতে উদ্যত হলেন সন্দীপ রায়।[১৭] দুবছর পর তাঁর সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন সুজয় সোম। ঝকঝকে ছাপা,তকতকে কাগজ,নামী দামী বুদ্ধিজীবীদের লেখা,কেরিয়ার ক্যাম্প,মনের কথা কই,মনে হল গৌরী সেন বুঝি বা সন্দেশে বিপ্লব আনল। নতুন স্লোগান উঠে এল,"বাঙালীর ছোটবেলা, চারপুরুষ ধরে"। কিন্তু হিসেব দাখিল করতে না পারায় টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিল ফোর্ড ফাউন্ডেশন। আবার অথৈ জলে পড়ল সন্দেশ।[১৮,১৯]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে অনিয়মিত হয়ে পড়লেও সন্দেশ আর ঝাঁপ বন্ধ করেনি। শুধু তাই নয়,নতুন লেখকরা আবার উঠে আসছেন সন্দেশের পাতা থেকে। রাজেশ বসু,হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত,অনন্যা দাশ,সুদীপ্ত দত্ত ও আরো অনেক লেখক-শিল্পীর কলরবে ভরে উঠছে সন্দেশের পাতা। সুনির্মল বসু থেকে অনিতা অগ্নিহোত্রী হয়ে রাকা দাশগুপ্ত,পাঠক থেকে লেখক হয়ে ওঠার ট্রাডিশনও সমানে চলছে। যদিও এই সন্দেশের পাঠক কারা অর্থাৎ মোটামুটি ৮ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সন্দেশের চাহিদা কতটা তা নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই যায়। কোথায় যেন পড়েছিলাম, *"সন্দেশ আসলে ফিনিক্স পাখি, বারবার নিজের চিতার আগুন থেকে সে পুনর্জন্ম নেয়"*। সেরা সন্দেশের ভূমিকায় লীলা মজুমদার লিখেছিলেন, *"ছোটদের দেখাতে চাই এই জীবনটা কত ভালো। জানাতে চাই ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি ঘটেছে,ঘটছে,ঘটতে যাচ্ছে। মানুষের মত মানুষ*

দেখাতে চাই। এমন মানুষ যারা ভালো কে ভাল আর মন্দকে মন্দ বলে। যারা দলাদলির বাইরে;যারা ঘৃণা করে শুধু মিথ্যাকে আর নিষ্ঠুরতাকে আর কুঁড়েমিকে। বাদ দেয় যত রাজ্যের ন্যাকামি আর ঢং। যারা বিশ্ব-প্রকৃতিকে তার ন্যায্য জায়গা দিতে প্রস্তুত। যাদের মন উদার। এত সবের সঙ্গে আমরা পাঠকদের খুশিও করতে চাই। খুশি করতে না পারলে আমাদের সব চেষ্টাই বৃথা।" [২০]

কোন গোরী সেন নয়,এই আদর্শ আর সন্দেশীদের মধ্যে অদৃশ্য ভালোবাসার সুতোটাই একশ বছর ধরে সন্দেশের প্রাণভোমরা। চিতার আগুনে আর সব পুড়ে গেলেও এগুলো পোড়ে না। বদলে যাওয়া দেশ ও সমাজের পটভূমিতে ফিনিক্স পাখির মত আবার উঠে দাঁড়ায় নতুন চেহারা নিয়ে।

তথ্যসূত্রঃ

[১] প্রেমেন্দ্র মিত্র, *ভূমিকা, উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী*, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রকাশন

[২] লীলা মজুমদার, *সুকুমার রায়*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

[৩] দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, মুদ্রণবিজ্ঞানী, আজকাল (রবিবাসরীয়, ১২ মে, ২০১৩)

[৪] খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

[৫] নলিনী দাশ, *সন্দেশ সম্পাদক সুবিনয় রায়*, সন্দেশ (অগ্রহায়ণ ১৩৯৮)

[৬] সত্যজিৎ রায়, *যখন ছোট ছিলাম*, আনন্দ পাবলিশার্স

[৭] অশোককুমার মিত্র, *এবারের সন্দেশ*, সন্দেশ (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮)

[৮] লীলা মজুমদার, *গল্পস্বল্প*, সন্দেশ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮)

[৯] নলিনী দাশ, *সন্দেশ সম্পাদক সত্যজিৎ রায়*, সন্দেশ (সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৯)

[১০] *অজেয় রায় কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠি*, দেশ (শারদীয়া ১৪১৯)

[১১] লীলা মজুমদার, *পত্রমালা*, লালমাটি

[১২] দেবাশীষ দেব, *সন্দেশের অলঙ্করণ*, সন্দেশ (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮)

[১৩] রাহুল মজুমদার, *সন্দেশের সেরা সম্পদ নলিনীদি*, সন্দেশ (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪১৮)

[১৪] জীবন সর্দার, *জবানবন্দী*, সন্দেশ (বৈশাখ-জৈষ্ঠ ১৪০৩)

[১৫] সুজয় সোম, *ফালতু খাতা*, সন্দেশ (শারদীয়া ১৪১২)

[১৬] দেবাশিস সেন, *সবার চেয়ে আলাদা*, সন্দেশ (বৈশাখ-শ্রাবণ ১৪১৮)

[১৭] Labonita Ghosh, *Legendary children magazine Sandesh goes in for a new look to revive old glory*, India Today (June 23, 2003)

[১৮] Kalyan Moitra, *Bitter days ahead of 'Sandesh'*, Times of India (Aug 30, 2006)

[১৯] *Children's treat in autumn*, The Telegraph (October 14, 2007)

[২০] লীলা মজুমদার, *ভূমিকা, সেরা সন্দেশ*, আনন্দ পাবলিশার্স

এছাড়াও সন্দেশের শতবর্ষ ও উপেন্দ্রকিশোরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন খবরের কাগজের প্রতিবেদন ও সন্দেশের নানা পুরনো সংখ্যার সাহায্য নিয়েছি। উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ বছর অনুযায়ী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছে পারুল প্রকাশনী। সুকুমার ও সুবিনয়ের সন্দেশের অনেকগুলো সংখ্যা জোগাড় করেছি ইন্টারনেট থেকে। যিনি বা যাঁরা এগুলো আপলোড করেছেন তাঁদেরকে অজস্র ধন্যবাদ।

সিনেমা মানে ঝিঁ ঝিঁ ভারতীয় সিনেমার একশো বছর –

উত্তরায়ণ সেনগুপ্ত

সিনেমা মানে নব্য প্রজন্মের এবং কর্পোরেট নজরিয়াতে "মুভি", পড়াকুদের কাছে "চলচ্চিত্র", আঁতেলদের এবং সিনেমা-ঠিক দের জন্য ফিল্ম (ভুল অনুকরন বা উচ্চারণ দোষে ফিলিম), সৌখিন মজদুরি করে শিল্প সংস্কৃতির জাল বুনে চলা রুচিবানদের কাছে "ছবি" (ব্ল্যাকার ভার্সনে "পিকচার"), বাড়ির প্রাচীনাদের, বোকাবাক্সে সন্ধে'র "সিরিয়াল" কিলারদের এবং ঠিকে কাজের মেয়েদের কাছে "বই"। দুনিয়াদারি তো ছেড়েই দিলাম; শুধুমাত্র ঘরের চৌকাঠেই এক বস্তু বিষ্ণুর মত ভিন্ন ভিন্ন নামে ও অবতারে প্রসিদ্ধ। গোঁড়া মৌলবাদী ও ঘুণ খাওয়া রাজনীতিকদের মোটা লেজ মাড়ালে কভি কভি নিষিদ্ধও বটে। সেই একইসাথে অভূতপূর্ব ও অর্বাচীন শিল্পটির একশোতম জন্ম বছরে আমরা দাঁড়িয়ে। এবার নামকরণের সার্থকতা ব্যাখ্যান্তে, ক'টা পুরনো কথা একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক।

আমাদের তথা ভারতীয় সিনেমার শুরুটা অনেকটা এইরকম। লুমিয়ের ভাইরা ১৮৯৬ সালে নিজেদের ছবির প্রদর্শন করালেন মুম্বাইতে । তখনও আমরা বুঝতে পারি নি যে গোটা চব্বিশেক স্টিল ছবি সেকেন্ডে চোখের নিমেষে চালিয়ে "ওই যে ছবি চলছে" বলে টলে আমাদের স্রেফ বোকা বানানো হচ্ছে। ছবি চলতে দেখে প্রথমে মানুষ তুমুল চমকে গেল। অবশ্য পরে আবার মজা পেয়ে কাছে টেনে নিল। কিন্তু সিনেমা ব্যাপারটা খায় না মাথায় দেয় সেটা মালুম হতে তখনো ঢের দেরি। তার প্রায় ষোল বছর পর ধুন্দরাজ গোবিন্দরাজ ফালকে নামে এক শিল্পগ্রাহী মারাঠি ব্রাহ্মণ ফরাসি ছবি "লাইফ অফ ক্রাইস্ট" দেখে ভয়ঙ্কর উৎসাহিত হয়ে একটা জুতের দেশি সিনেমা বানাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগলেন। বিলেত ভ্রমণ করে সিনেমা তৈরির কলাকৌশল শিখে একখানি উইলিয়ামসন ক্যামেরা পর্যন্ত জাহাজে করে নিয়ে এলেন। কলা, ভাস্কর্যে পড়াশোনা এবং ভাবনার

শক্তি তো তার ছিল। গভীর অধ্যাবসায় নিয়ে বানিয়ে ফেললেন "রাজা হরিশচন্দ্র" নামে নিখাদ দেশি একটি নির্বাক সিনেমা। এবার সেটাকেই প্যারামিটার করে পণ্ডিতরা আঙুল গুনে হিসেব কষে ভারতীয় সিনেমার একশো বছর লিখে একখানি জবরদস্ত স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছেন। এটা ঠিক যে, শুরু একটা করতেই হত। কিন্তু সেই শুরু কেন ১৮৯৮ তে বানানো হিরালাল সেনের "ফ্লাওয়ার অফ পার্সিয়া" থেকে হল না বা ১৯১২ তে দাদাসাহেব টোর্নের তৈরি "পুণ্ডলিক" থেকে হতে পারে না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। হতে পারে দুটোই থিয়েটারের স্রেফ রেকর্ডিং, সম্পাদনা বস্তুটাই নেই; কিন্তু লুমিয়ের ভাইদের তোলা ছবিকে সিনেমা বলে জড়িয়ে ধরতে পারলে ভারতীয় হিসেবে হিরালাল সেনের নামে ঝটপট "ভারতীয় সিনেমার জনক" বলে স্ট্যাম্প ছাপিয়ে ফেলা উচিৎ ছিল। কিন্তু তা হয় না। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সখ করে ১৯৩২ নাগাদ "নটীর পুজো" সিনেমা বানালেন, তাকেও একই যুক্তিতে সিনেমা বলতে আমাদের ঘোর আপত্তি থাকা উচিত। কিন্তু কেউ কি বলতে পেরেছে- "গুরুদেব এসব যন্ত্রপাতির জগতে নাক না গলালেই পারতেন, এটা সিনেমা হিসেবে কিসসু হয় নি"। হিরালাল সেন মহাশয়কে ছেড়ে দিলাম; কারন তার সৃষ্টির প্রমাণসমুহ ভস্মীভুত। কিন্তু "পুণ্ডলিক" ১৯১২ সালে মুক্তি পেয়েছিল এবং সপ্তাহ দুয়েক বেশ ভালো চলেছিল বলে জানা যায়। শুধু সেন্সর সার্টিফিকেটে নাম না থাকার অথবা ফিচার দৈর্ঘ্য না থাকবার দোহাই দিয়ে পেছনে সরিয়ে দেওয়া কেন?

বিতর্ক আছে এবং থাকবেই। রিসার্চ স্কলার ছাড়া কে মাথা ঘামায় এই সবে। যদি রেসিপি রহস্য নিয়ে মাথা না চুলকে; নিজের হাত, আঙুল কিছুই না পুড়িয়ে সাজানো প্লেটে বিরিয়ানি মেলে, তাহলে সেই বিরিয়ানি খোদ লখনউ থেকে এলো না পার্ক সার্কাস থেকে; তার তোয়াক্কা করতে আমাদের বয়েই গ্যাছে। আরে যে কোন ধাতব জুবিলি তো আসলে খ্যাঁটনের আদর্শ মঞ্চ। ইদানীংকালের ঘটে যাওয়া একটা সার্ধ শতবর্ষ মনে নেই! কেমন হা হাভাতের মত খুঁটে খুঁটে পাড়ায় পাড়ায় খেঁদি বুঁচকিদের দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এবং মাচায় নাটক বাগিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের

শ্রাদ্ধ করে টু পাইস ইনকাম ঠুকেছিলেন। কে বলতে পারে সিনেমার এই তথাকথিত একশো বছরে কিছুক্ষনের জন্য ঘোর রাবীন্দ্রিক তারাই ভোল পাল্টে "জয় বচ্চন, জয় রজনি; ভাঁড়ে আমাদের মা ভবানী" স্লোগান দিতে দিতে তড়িঘড়ি কিছু একটা বইটই লিখে ফেলবেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের "মানিকবাবু" নিয়ে আর কিছু বলার অবশিষ্ট না থাকলেও টুঁটি চিপে বলিয়ে ধারাবাহিক ছাপাবেন, সুযোগ বুঝে তথ্যচিত্র বানাবার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে নির্লজ্জের মত দরবার করবেন। জিজ্ঞেস করলে অজুহাত দেবেন "আরে মশাই দাদাসাহেব ফালকেও তো ছবি তৈরির জন্য স্ত্রীর গয়না-টয়না বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমরা তো কোন ছার" ।

যাই হোক হরিশ্চন্দ্রের সাফল্যের পর নির্বাক সিনেমা নিজের পথ খুঁজে নিল। তবে বেশির ভাগটাই সেই পুরাণ বা রাজা রাজড়ার গপ্প। এটা বলতেই হবে যে ভারতীয় সিনেমার শুরু থেকেই পরিচালকরা দর্শকের জন্য ছবি বানাতে শুরু করেছিলেন। যার বিষয়বস্তু "দ্য ডার্টি পিকচার"এ-র বিদ্যা বালনের ভাষায় "এন্টারটেইনমেন্ট, এন্টারটেইনমেন্ট এবং এন্টারটেইনমেন্ট"। যে ভাবেই হোক দর্শকদের দৃষ্টিসুখের ব্যবস্থা করা। এভাবেই দর্শকের পছন্দ এবং সমাজ রাজনীতি মেনে যুগ যুগ ধরে একের পর এক নতুন জঁরের বা প্রজাতির ছবি তৈরি হয়েছে। এমনকি মিলিয়ে মিশিয়ে জঁর তৈরি করেও নেওয়া হয়েছে । হয়তো সে কারনেই ভারতে কখনো কোন পৃথক বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফিল্ম মুভমেন্ট তৈরি হয় নি। তবে অর্থনৈতিক বা মানসিক দৈন্যতা যাই থাক না কেন এতে কিছুই এসে যায়নি।

কুড়ির দশক থেকে সিনেমা সাধারন দর্শকের কাছে চার পয়সার টিকিট হিসেবে ধরা দিলো অর্থাৎ সহজলভ্য হল। সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমার বিষয়ে বা গল্পে অবধারিত ভাবে ঢুকে পড়ল সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষ। ততদিনে ভেঙ্কাইয়া নাইডু ও এস.এস.ভাসান তামিল ও তেলেগু ছবি বানাবার জন্য মাদ্রাজে প্রোডাকশন হাউজ বানিয়ে ফেলেছেন। সাবালক হচ্ছে সিনেমা। ১৪ই মার্চ, ১৯৩১ সালে মুক্তি পাওয়া আরদেসির ইরানী'র "আলম আরা" ভারতীয় সিনেমায় ছবির সঙ্গে শব্দ নিয়ে এল।

একই বছরে তামিলে মুক্তি পেল টকি ছবি "ভক্ত প্রহ্লাদ" এবং তেলেগুতে "কালিদাস"। সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমায় নৃত্য এবং সঙ্গীত ব্যবহারের বাড়বাড়ন্ত দেখা গেলো। "ইন্দ্রসভা" বা "দেবী দেব্যায়নি" এর মস্ত প্রমাণ। ইন্দ্রসভা ছবিতে তো ঊনষাটখানা গান ব্যবহার করা হল অর্থাৎ সংলাপ ছাপিয়ে গান উঠে এলো। এখন এসব আদিখ্যেতা মনে হতে পারে কিন্তু এটাও মানতে হবে যে শব্দের মত একটা শক্তিশালী মাধ্যমের সাথে ইমেজ বা ছবির বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিতে সময় লাগে। ইউরোপেও লেগেছিল। আমেরিকাতেও লেগেছিল। তবে অনুপান হিসেবে এর সঙ্গেই ভারতীয় সিনেমা খুঁজে পেল তার চিরকালীন জনপ্রিয়তার অমোঘ অস্ত্র বা ফর্মুলা। সংক্ষেপে ভারতীয় সংস্কৃতির সমস্ত খারাপ ব্যাপারগুলো লুকিয়ে রেখে শুধু যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যের ধুয়ো ধরে নাচে, গানে ইনোসেন্ট এবং দৃষ্টিনন্দন মোড়ক তৈরি করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। কলকাতা, বোম্বে, চেন্নাই তখন সিনেমা সংস্কৃতির তিন কেন্দ্র। ১৯৩৫-এ প্রমথেশ বড়ুয়ার "দেবদাস" এর দেশময় সাফল্যের সৌজন্যে সিনেমা শুধু পুরাণের গল্প আর মোটা দাগের নাচ গান ছাড়াও শিল্পের জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। চল্লিশের দশকে দক্ষিণ ভারতীয় মশালা সিনেমা মাতিয়ে রাখল ভারত। ব্যঙ্গার্থে মশালা মানে নাচ, গান, ইমোশন, ঝাড়পিট ঠিকঠাক অনুপাতে মেশানো প্যাকেজ। স্বাধীনতার পূর্বে সিনেমায় দেশপ্রেমিকতা দেখাবার একমাত্র উপায় ছিল গানের কথায় কথায় নিষিদ্ধ শব্দ পুরে দেওয়া। তারই নবরূপে সেন্সরের কাঁচিকে বোকা বানিয়ে গানের কথায়, ইশারায় যৌনতার অনুপ্রবেশ ঘটল। এবং "সেই ট্র্যাডিশন এখনো সমানে চলছে"। অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখবার মত; ঢেকে রাখছি কিন্তু গন্ধ আড়াল করবার কোন চেষ্টা নেই। বেড সিন, চুম্বনে মেটাফোর আর লুকোনো লিরিক। এদিকে পায়ের নিচের মাটি পালটে যাচ্ছে। পরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশভাগ পরিচালকদের খোরাক দিলো নতুন অনেক বিষয় নিয়ে ভাবার। পঞ্চাশের দশক ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগ। যার শুরু চেতন আনন্দের "নিচা নগর" দিয়ে; পরপর ১৯৫২-তে ঋত্বিক ঘটক বানালেন 'নাগরিক", ১৯৫৩-তে বিমল রায়ের "দো বিঘা জমিন"। বাংলায়

উত্তম-সুচিত্রা জুটি বেঁধেছেন; ফিল্ম নয়ার ধাঁচে এক এর পর এক হিট ছবি তৈরি হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ কপুর স্বয়ং তার তিন ছেলে রাজ, শাম্মি আর শশীকে নিয়ে পর্দা জুড়ে রয়েছেন। তার সাথে দেব আনন্দ, দিলিপ কুমার, নার্গিস, ওয়াইদা রেহেমান এবং গুরু দত্ত, রাজ কাপুরের মত ব্যবসায়িক ছবির তুমুল প্রতিভাধর অভিনেতা-পরিচালকরা। তৈরি হয়েছিলো "পিয়াসা", "কাগজ কে ফুল", "আওয়ারা-"র মত সিনেমা। তবে "পিয়াসা" বা "মাদার ইন্ডিয়া-"কে আই.পি.টি.এ'র বাস্তবমুখি নাটকগুলির ফলশ্রুতি বললে মনে হয় না ভুল হবে। চল্লিশের দশকে বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটক থেকে শুরু হয়ে সিনেমায় ধুসর বাস্তবের বীজ বোনা শুরু হল ১৯৪৬-এ তৈরি খোজা আহমেদ আব্বাসের "ধরতি কে লাল" ছবি থেকে। ১৯৫৫-তে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় নিও রিয়ালিজম উপহার দিলেন "পথের পাঁচালী"-তে। বিশ্বসিনেমার ম্যাপে স্থায়ী খুঁটি গেড়ে বসার সুযোগ পেল ভারতীয় সিনেমা। অপু ট্রিলজির জন্য দুনিয়াভর থেকে আসতে শুরু করল পুরস্কার। স্বর্ণযুগের শেষ পর্বে অস্কার পুরস্কারের জন্য নমিনেটেড হল মেহেবুব খানের "মাদার ইন্ডিয়া", কাব্যিক বিশালতা নিয়ে চমকে দিলো কে আসিফের "মুঘল-এ-আজম"। দক্ষিণে রামচন্দ্রন, শিবাজি গনেশন, রাজকুমাররা পথ তৈরি করে দিলেন ভবিষ্যতের রজনিকান্ত, কামাল হাসান, চিরঞ্জীবিদের জন্য। সত্তরের দশক শোলে, জঞ্জির আর দিওয়ারের সময়। রাজেশ খন্না নামক একজন হিট মেশিনের শেষ এবং সিস্টেমের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় সাধারন মানুষের হয়ে লড়াই ছুঁড়ে দেওয়ার প্রতীক হিসেবে অমিতাভ বচ্চন নামে একজন অ্যাংরি ইয়ং ম্যানের শুরু। ল্যাতপ্যাতে মার খাওয়া রোম্যান্টিক জমানার নায়ক থেকে "কুলি" হি ম্যান। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়ায় বদলে গেলো চাহিদা। চরিত্র, গল্প, উপাদান পাল্টে গেলো। মশালা ছবির নতুন সংজ্ঞা লেখা হল। দেব আনন্দ, ধর্মেন্দ্র, জিতেন্দ্র, বৈজয়ন্তিমালা, শর্মিলা ঠাকুর, শ্রীদেবী, রেখা, হেমা মালিনী ছিলেন উপকরণ হিসেবে। তাই রান্না যেমনই হোক, খাবার লোকের অভাব হয়নি। এই সত্তরেই সিনেমা নিখাদ শিল্প হিসেবে মাত্রা পেয়েছিল বাংলায় সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন,

গৌতম ঘোষ; হিন্দিতে শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনি, কুমার সাহানি, মালয়ালমে আদুর গোপালকৃষ্ণান, জি অরভিন্দন, জন আব্রাহাম এবং ওড়িয়া সিনেমায় নিরদ মাহাপাত্রদের হাত ধরে। যদিও আর্ট সিনেমার ট্যাগ ঝুলিয়ে এদের ছবি সবসময়েই ব্যবসায়িক ছবির বাজার থেকে আলাদা করে রাখার একটা চেষ্টা ছিল। বলা বাহুল্য সমালোচকদের আভিজাত্য খোঁজার এই অকারণ প্রচেষ্টায় কখনই সিনেমা শিল্পের ক্ষতি বই উন্নতি হয় নি। আশির দশক থেকে নব্বইয়ের শুরু পর্যন্ত শুধু ভাঙন। কিছু ব্যতিক্রমি প্রোডাকশন ছাড়া হিন্দি সিনেমার জন্য সবচেয়ে খারাপ সময়। কিন্তু এই দশ বছর মালায়ালম তথা দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার জন্য স্বর্ণযুগ। কারন তখন ছবি করছেন আদুর, অরভিন্দনরা। আশির শেষ দিকে দক্ষিণ খুঁজে পেল মণিরত্নমকে। যিনি পরে "রোজা" এবং "বম্বে"র মত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ছবি করবেন এবং উপহার দেবেন ভারতের একমাত্র অস্কার জয়ী সঙ্গীত পরিচালক এ.আর.রেহমানকে। হিন্দি সিনেমা আবার ভালোবাসায় বক্স অফিসের ভাষা খুঁজে পেল "কেয়ামত সে কেয়ামত তক" ছবি থেকে। শাহরুখ, সলমন, আমির তিন খান টানতে শুরু করলেন বাণিজ্যিক ছবির জোয়াল। ফ্রেমের শরীরে নতুন রক্ত ঢুকল। বিংশ শতকের শুরুতে রাম গোপাল ভার্মা, বিশাল ভরদ্বাজ, অনুরাগ কাশ্যপদের সঙ্গে ঘটল বলিউডের দুবাই প্রবেশ। একের পর এক তৈরি হতে লাগলো শিবা, সত্যা, কোম্পানি, ডি কোম্পানি ইত্যাদি গ্যাংস্টার মার্কা সিনেমা। একদিকে মুম্বাইতে পরিচালকরা তন-মন-ধন দিয়ে অসংখ্য ডন বানিয়ে চলেছেন অপরদিকে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি অসংখ্য অর্থহীন ছবি তৈরির আঁতুড়ঘর হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষরা এলেন এবং সাড়া জাগালেন। কিন্তু তারা কোনোমতেই পূর্বসূরি দুই জিনিয়াসের উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারলেন না।

তবে ভারত জুড়েই সিনেমা সাহসী হল গল্পে নিত্য নতুন বিষয় বেছে নিতে, ক্যামেরাকে মাটির আরও কাছাকাছি টেনে নামাতে, যৌনতাকে কারনে অকারনে প্রশ্রয় দিতে। 'সিনেমায় মেয়েদের স্থান' নিয়ে তুখোড় ডিবেট হয়, প্রবন্ধ লেখা হয়। সত্যি বললে পরিধানের সাইজ ম্যাক্রো থেকে

মাইক্রো এবং দুর্দান্ত কোরিওগ্রাফি সাজানো আইটেম সং ছাড়া বাণিজ্যিক ছবিতে নায়িকাদের গুরুত্ব সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আদৌ বাড়েনি। হয়তো একসময় বিকিনি পরার মত একজন সাহসী শর্মিলা ঠাকুর পাওয়া যেত এবং এখন হাজারো মল্লিকা সেরাওয়াত পাওয়া যায়। স্টুডিয়োর খাঁচায় পটের পুতুল সেজে না থেকে এখন একটু আধটু রাস্তার ধুলোয় পা ময়লা হচ্ছে। ব্যস এটুকুই ।

নির্বাক থেকে ডলবি, সাদাকালো থেকে থ্রিডি পর্যন্ত গ্লোবালাইজেশনের জন্য ভারতীয় সিনেমা সরকারি বা বেসরকারি ছাপ্পার ধার ধারে নি কখনো। বরং অনেক আগে থেকেই তা বিশ্বজনীন। করণ জোহর, সুভাষ ঘাই, সঞ্জয় লীলা বন্সালিদের সিনেমা বিদেশে ব্যবসার দরজা খুলে দিয়েছে বহুদিন। ভিনদেশের ভারতীয়রা মুঠো মুঠো টাকা গচ্চা দিয়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য দেশপ্রেমে নষ্টালজিক হতে পিছপা হন না। বছরে গড়ে হাজারের ওপরে ছবি তৈরি করে গত ২০১০ সালেই চিন এবং হলিউডকে পেছনে ফেলে দিয়েছে ভারতীয় সিনেমা। গত বছর থেকে অন্তত বারোটি ছবি একশো কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে। মিউজিক রাইট এবং টিভি রাইটের কল্যাণে অনেক ছোট ছবিও লসের হার্ডল পেরিয়ে যাচ্ছে। সিনেমা হল কমলেও বাড়ছে মাল্টিপ্লেক্স। তার মানে মানুষ ছবি দেখছে এবং ভারতে ৩৫ মিমির অন্ধকার ঘেরা রুপোলি পর্দার রোমাঞ্চ এখনো অনেকটাই অক্ষত। এই সার সত্যটা অনেক আগে বুঝেছিল হলিউড। কিন্তু তারা বহু চেষ্টা করেও ইউরোপের মত ভারতের বাজার গিলে খেতে পারে নি। তাই উপায়ান্তর না দেখে টোয়েনটিন্থ সেঞ্চুরি ফক্স, সোনি পিকচার্স, ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রভৃতি প্রযোজকরা ভারতীয় ছবি প্রযোজনায় লাভের মুখ দেখতে চাইছে। বাইরে থেকে লগ্নি আসায় লাভ তো আমাদেরই। তবে এই তথাকথিত একশো বছরে এসে আক্ষেপও কম নেই। যেখানে স্বয়ং দাদাসাহেব ফালকের অভিযান শুরু হয়েছিলো পুনের থেকে আরও দশ কিলোমিটার দূরে নাসিক নামে একটি ছোট্ট শহরে, তার সৃষ্টির একশো বছর পরেও আঞ্চলিক সিনেমা ভীষণ অবহেলিত। ভারত জুড়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক খণ্ডে প্রতিভা প্রচুর

কিন্তু তাদের সিনেমার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে কোন প্রচার নেই। টাকা বা লাইম লাইট সবই মুম্বাই বা বলিউডের ওপর ফোকাসড। যতদিন পর্যন্ত না আঞ্চলিক সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিগুলি হিন্দি ছবির কিছু শতাংশ জাতীয় এবং বিজাতীয় দাক্ষিণ্য লাভ করবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতীয় সিনেমার সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয় এবং সিস্টেমকে বারবার ঝাঁকিয়ে দেওয়ার জন্য বেশ কিছু "বব বিশ্বাস"এ-র প্রয়োজনও রয়ে যাবে।

শব্দছক

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত

১			২	*	৩		৪
	*	*		*		*	
	*	৫					
৬			*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	৭		৮
৯		১০		১১		*	
	*		*		*	*	
১২			*	১৩			

সূত্রঃ-

পাশাপাশি

১. কুৎসিত, বিকট

৩. ফুলের রেণু

৫. উপবাসি, ক্ষুধায় দুর্বল মানুষ

৬. অত্যন্ত লম্বা

উপর-নিচ

১. সুর্যের সমশব্দ

২. ফাজিল লোক

৩. শাহরুখ খানের তোতলামিতে সুর্যের রশ্মি

৪. ক্ষুদ্রতম সংখ্যা

৭. প্রাচীন কালে যুদ্ধে ব্যবহৃত বাদ্য

৯. সীমাহীন, চরম বিপদ

১২. প্রাতরাশ, জলখাবার

১৩. নাভি পর্যন্ত লম্বা হার

৫. মূল্য বা দাম

৮. চিরহরিৎ লতাবিশেষ

৯. পথ, ব্যূহপথ

১০. ও কে আজ চলে যেতে বল না, ও ___

১১. খাড়া করে গাঁথা গাঁথনি

উত্তরঃ-

পাশাপাশি

১. বিদঘুটে

৩. কিঞ্জল

৫. অনশনক্লিষ্ট

৬. সুদীর্ঘ

৭. দামামা

৯. অকূলপাথার

১২. নশতা

১৩. ললন্তিকা

উপর-নিচ

১. বিভাবসু

২. টেটেন

৩. কিরন

৪. লঘিষ্ট

৫. অর্ঘ

৮. মাধবিকা

৯. অয়ন

১০. ললিতা

১১. থামাল

কৃতজ্ঞতা

‘অবকাশ’-এর এগিয়ে চলার পথে, অবকাশের গঠন, মান-মনন প্রভৃতির প্রভূত উন্নতিতে যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও বদান্যতা লাভ করেছি -

অনুপম করণ

গুলনার মণ্ডল

প্রত্যয়দীপ্ত রুদ্র

সুমন দাস

চঞ্চল প্রামাণিক

পরিচয় সেনগুপ্ত

ও

আরও অনেকে

দু হাত দিয়ে বিশ্বরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে ।।

pathagar.net ও chorjapod.com -এর যৌথ নিবেদন...